বারবার ফিরে আসি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা—৯

প্রকাশক ঃ
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা, জানুয়ারী, ১৯৫৩
মাঘ, ১৩৫৯

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রণে ঃ
এম. এম. প্রিণ্টার্স
৩৫, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৫

জয়শ্রী ও শ্যামল সেন

প্রথম পর্ব

রবিবার ছাড়া প্রতিটি সকাল একেবারে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। বাড়িতে ঘড়ির সংখ্যা একুশটি, জ্ঞানব্রতর খুব ঘড়ির শখ। দেশেবিদেশে যখনই বেড়াতে যান, বিভিন্ন আকৃতির একটি করে ঘড়ি সংগ্রহ করে আনেন। এগুলোতে চাবিও দেন তিনি নিজের হাতে।

এ ছাড়া ডাইনিং হলে আছে একটি বড় দেওয়াল ঘড়ি। এটা জ্ঞানব্রতর বাবার আমলের। এখনো বেশ চলে, দু'এক বছর অন্তর অন্তর অয়েলিং করতে হয় শুধু। টক্ টক্ টক্ টক্ করে সেটিতে প্রতি মুহূর্তের শব্দ হয়। জানিয়ে দেয় যে সময় চলে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজবার একটা খ-র খ-র আওয়াজ ওঠে, সেই আওয়াজ শুনলেই রান্না ঘরে কান খাড়া করে রতন। ডেকচিতে গরম জল চাপানোই থাকে, ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে বাথরুমে স্নানের জল দেবো?

বার মাসই গরম জলে স্নান করা অভ্যেস জ্ঞানব্রতর।

ন'টা পর্যন্ত বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়েন, রতন এসে গরম জলের কথা বললেই স্নানের ঘরে চলে যান।

সাড়ে ন'টায় খাওয়ার টেবিলে। দশটায় ড্রাইভার গাড়ি বারান্দার নীচে গাড়ি বার করে তৈরী থাকে।

স্মরণকালের মধ্যে কোনো দিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

সুজাতা নিজের হাতে কিছু রান্না করে না বটে, কিন্তু খাবার পরিবেশন করে নিজের হাতে। রতন সব কিছু সাজিয়ে রেখে যায় টেবিলে ওপরে।

খাবার টেবিলে এই আধঘন্টা সময়ই যা সুজাতার জ্ঞানব্রতর সঙ্গে কতাবার্তা হয় সকালে।

জ্ঞানব্রত ওঠেন খুব ভোরে। সুজাতার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ন'টা বেজে যায়। জেগে উঠেই কোনরকমে হুটোপাটি করে মুখ চোখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে ছুটে আসে খাবার টেবিলে। সুজাতা না আসা পর্যন্ত খালি প্লেট সামনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন জ্ঞানব্রত। সুজাতা এসেই বিভিন্ন পাত্রের ঢাকনা খুলে বলে, আজ, কী কী করেছে দেখি? এঁচোড়ের তরকারি, চিংড়ি মাছের মালাইকারি···পনির দিয়ে পালং শাক করে নি? রতন, রতন।

ছেলে পড়ে দার্জিলিং-এর কনভেণ্ট স্কুলে, মেয়ে উজ্জয়িনীর স্বভাব-টাও অনেকটা মায়ের মতন। কলেজে যাবার ঠিক আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এজন্য মেয়েকে কোনদিন শাসন করেন নি জ্ঞানব্রত, কারণ স্কুলে প্রতিটি পরীক্ষায় সে ফাস্ট হয়েছে, পঞ্চম স্থান পেয়েছে স্কুল ফাইনালে। ও রাত জেগে পড়ে। উজ্জয়িনীর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে, তাই বোধ হয় ফরাসীদের মতন ওর রাত জাগার অভ্যেস।

জ্ঞানব্রতকে খাবার দিয়ে সুজাতা সেই সঙ্গে নিজে চা খায়। সুজাতার বয়স, এখন ঠিক চল্লিশ, কিন্তু শুধু সাজপোষাকের গুণেই নয়, তার শরীরটা এখনো এমন তাজা সে তার বয়েস তিরিশ বললে কেউ চট করে অবিশ্বাস করবে না। সপ্তদশী উজ্জয়িনী যে সুজাতার মেয়ে তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না, ভাবে বুঝি দুই বোন।

সুজাতার চেয়ে ঠিক দশ বছরের বড় জ্ঞানব্রত, পুরুষ মানুষের পক্ষে এ বয়েস কিছুই নয়। শরীরটা তাঁর ভাঙতে শুরু করেছে। মাথায় কাঁচার চেয়ে পাকা চুলই বেশী, চামড়ায় নেই মসৃণতা, চোখের দু'পাশে কালের পায়ের ছাপ। সার্থকতা তাঁর শরীর থেকে মূল্য আদায় করে দিয়েছে।

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালো সুজাতা। জ্ঞানব্রত তিন মাস আগে সিগারেট-চুরট পাইপ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন, সুজাতা ওসব কিছু চিন্তাই করে না।

সকালের প্রথম সিগারেটটিতে পরিতৃপ্তির সঙ্গে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো ঃ

—তুমি আজ কখন গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে পারবে?

জ্ঞানব্রত বললো, তোমার কখন চাই বলো?

—সাড়ে এগারোটায়!

—তার মানে সাড়ে বারোটা তো?

সুজাতা হাসলো।

জ্ঞানব্রতর যেন প্রতি মুহূর্তে ঘড়ির হিসেব, সুজাতা তার ঠিক উল্টো। বাড়ী থেকে যদি সাড়ে এগারোটায় বেরুবে ভাবে তো, কিছুতেই

সে বারোটার আগে তৈরী হতে পারে না। জীবনে একটা সিনেমাও বোধ হয় সে শুরু থেকে দেখতে পারে নি।

—কোথায় যাবে?

—আমাদের মহিলা সমিতির একটা মিটিং আছে।

—ঠিক আছে, সাড়ে এগারোটাতেই গাড়ি আসবে।

—চুমকি এই রবিবার ওর বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যেতে চায়। তোমাকে কিছু বলেছে?

—তোমাকে বলাই তো যথেষ্ট। কোথায় যাবে?

—ব্যাণ্ডেল।

জায়গাটার নাম শুনতে পেলেন না জ্ঞানব্রত, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

ঠিক এই সময়েই তিনি শুনতে পেলেন গানটা।

যোধপুর পার্কে একেবারে আনোয়ার শা রোডের ওপর মাত্র দু বছর আগে তৈরী করেছেন এই নতুন বাড়ী। সামনে বড় রাস্তা তার উল্টোদিকেই একটা পার্ক, সুতরাং সামনের দিকটা কোনদিন ব্লকড হবে না। সাত কাঠা জমি, সামনে খানিকটা বাগান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দোতলায় চারখানা ঘর, নিচে চারখানা। নিচ তলাটা পুরোই ভাড়া দেওয়া হয়েছে চেক কনসুলেটের ফার্স্ট সেক্রেটারীকে। দুটি গ্যারাজ।

যখন এই বাড়ী বানান জ্ঞানব্রত তখন ডান পাশের তিন কাঠার জমিটাও কিনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মালিকানা নিয়ে কি যেন গণ্ডগোল ছিল। হঠাৎ এই ছ'মাস আগে সেখানে একটা তিনতলা বাড়ী উঠে গেছে। অনেক লোকজন, বেশ গোলমাল হয় ও বাড়ীতে। বিভিন্ন তলায় একই সঙ্গে রেডিও রেকর্ড প্লেয়ার চলে। এইসব আওয়াজে জ্ঞানব্রত একটু বিরক্ত হন, কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই।

সেই রকমই, ও বাড়ির রেডিওতে একটা গান বাজছে। সেদিকে হঠাৎ মন আটকে গেল জ্ঞানব্রতর।

…শহরে ষোলজন বোম্বেটে,
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরমণি

নালিশ করিব আমি, কোনখানে কার নিকটে।
পাঁচজনা ধনী ছিল,
তারা সব ফতুর হলো।

গানটা শুনতে শুনতে জ্ঞানব্রতর মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

— ও কি, তুমি পুডিংটা খেলে না।

যতই সাহেব মানুষ হন জ্ঞানব্রত, অফিস থেকে দুপুরে তিনি কোথাও লাঞ্চ খেতে যান না। দোকানের খাবার তাঁর একেবারে পছন্দ নয়। ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার তিনি। সেখানে মাঝে মাঝে যান সাঁতার কাটতে। তারপর দু'এক পেগ মদ্যপান করেন। কিন্তু কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করেন না।

সকালবেলা বাড়ীর রান্না তিনি খেয়ে যান তৃপ্তির সঙ্গে। আজ বিমর্ষভাবে বললেন, পুডিং ? না, থাক, খেতে ইচ্ছে করছে না।

—হঠাৎ তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলে ?

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। কোনো কথা বলছো না। শরীর ঠিক আছে তো ?

—শরীর ? হ্যাঁ, শরীর ভালো আছে।

উঠে বাথরুমে চলে গেলেন তিনি। আয়নার দিকে চেয়ে তার মনে হলো, চুল কাটা দরকার। প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবার তার চুল কাটার দিন। আজ মাসের মোটে অর্ধেক। এর মধ্যে চুল বেশী বড় মনে হচ্ছে কেন।

জ্ঞানব্রতর বাবার ছিল মাথা ভর্তি টাক। সবাই বলতো জ্ঞানব্রতরও চুল থাকবে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও চুল একটুও পাতলা হয় নি।

বাবাকে অবশ্য খুব ভালো মনে নেই জ্ঞানব্রতর। তিনি যখন মারা যান তখন জ্ঞানব্রতর বয়স এগারো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে হাতের ঘড়িটা দেখলেন। দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। এখন তিনি খয়ের ছাড়া একটি পান খাবেন। তারপর গলায় টাই বাঁধবেন। সিগারেট চুরুট ছেড়ে দেবার পর এই পান

খাবার অভ্যেসটা হয়েছে।

নিজের ঘরে যেতে বাঁ পাশে মেয়ের ঘর পড়ে। দরজাটা খোলা, সারা বিছানা তছনছ করে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে উজ্জয়িনী। মায়ের চেয়েও বেশী রূপসী হয়েছে, ঠিক যেন এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। একটুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্ঞানব্রত। দেখতে দেখতে এত বড় হয়ে গেল? আর কিছুদিন পরেই কোনো পর-পুরুষের হাতে ওকে সঁপে দিতে হবে!

ছেলে শুভব্রতর বয়েস চোদ্দ, বছরে মাত্র তিনমাস দেখা হয় তার সঙ্গে।

সুজাতার গালে একটা অন্যমনস্ক চুমু দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীরভাবে নামতে লাগলেন তিনি।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে দরজা খুলে তটস্থভাবে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার।

গাড়ি একেবারে চকমকে তকতকে না থাকলেই বিরক্ত হন জ্ঞানব্রত। আজ সেদিকে নজর দিলেন না, উঠে বসলেন।

প্রথমে যেতে হবে বেহালার কারখানায়? কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগে। এই সময়টুকু তিনি ঘুমিয়ে নেন। গাড়িতে ওঠা মাত্র চোখ বুজে আসে।

আজ ঘুম এলো না।

নিজেই তিনি একটু বাদে অবাক হয়ে ভাবলেন, আমার মন খারাপ লাগছে কেন? কোন কারণ নেই তো! শরীরও খারাপ নয়। তাহলে?

এর পরেই মনে এলো সেই গানের কথাগুলো:

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল—

তারপর?

বাকি কথা আর মনে পড়ছে না। সুরটা অবশ্য ঘুরছে মাথার মধ্যে।

এ গানের মানে কী?

জ্ঞানব্রত খুব যে একটা গান-বাজনার ভক্ত তা নয়। তার বাড়িতে বিলিতি রেকর্ডই বাজে বেশী। বড় জোর দু'চারটে রবীন্দ্র সঙ্গীত। এ গান তো মনে হচ্ছে দেহতত্ত্ব বা ঐ ধরনের, এ সব গান কে শুনবে?

রেডিও আছে, কিন্তু কক্ষনো খোলা হয় না। জ্ঞানব্রত শেষ রেডিও শুনেছেন ইলেকশনের খবর শোনার জন্য। নিয়মিত রেডিও শোনে মধ্যবিত্তরা।

কারখানার গেটের কাছে যখন গাড়ি এসেছে, তখন জ্ঞানব্রতর মনে পড়লো, নিল তারা সব লুটে। শহরে ষোলজন বোম্বেটে—করিয়ে পাগল পারা নিল তারা সব লুটে…।

জ্ঞানব্রত এই গানটা যেন আগে কখনো শুনেছেন।

কবে, কোথায়?

কারখানার দেখাশুনোর ভার তাঁর ভাগ্নে শেখরের ওপর। জ্ঞানব্রত এ কারখানা নিয়ে মাথা ঘামান না, শিগগিরই মাদ্রাজে আর একটি কারখানা খুলবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন। তবু রোজ একবার করে এখানে আসেন। শেখর কিছু কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, জ্ঞানব্রত সেই সব রিপোর্টের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে হ্যাঁ কিংবা না বলে দেন।

একুশ বছর আট মাস বয়েস পর্যন্ত জ্ঞানব্রত ছিলেন এক অতি সাধারণ রিফিউজি ছোকরা। পড়াশুনোয় ভালোই ছিলেন, কিন্তু শৈশবে পিতৃহীন বলে মামার বাড়িতে মানুষ, টিউশানী করে নিজের খরচ চালাতে হতো।

মামুদের অবস্থা ভালো ছিল না। জ্ঞানব্রতর মা ছিলেন তার ভাইদের বাড়ীতে বিনি-মাইনের রাঁধুনি।

টুথপেস্টের ছিপির মধ্যে যে একটা ছোট্ট গোল শোলার চাক্তি থাকে, সেই দিয়ে ব্যবসা শুরু। ঐ ছোট্ট জিনিসটাও খুব জরুরী, ওটা থাকে বলেই টিউব থেকে টুথপেষ্ট বেরিয়ে আসে না। অত ছোট জিনিস কোন টুথপেষ্ট কোম্পানি নিজে বানায় না, বাইরে থেকে কেনে। মূলধন ছিল মাত্র দেড়শ টাকা। একটা পাঞ্চিং মেশিন আর কিছু কাঁচা মাল। কারুকে না জানিয়ে জ্ঞানব্রত শুরু করেছিলেন এই কারবার, পুরোটা লোকসান গেলেও তো তার নিজের দেড়শো টাকাই যাবে।

এখন তিনি একটি প্রখ্যাত মার্কিন টুথপেষ্ট কোম্পানীর সঙ্গে কোলাবোরেশনে এদেশে তৃতীয় টুথপেষ্ট কারখানা খুলেছেন। মামাদের উপকারের ঋণ শোধ করে দিয়েছেন তিনি, প্রত্যেক মামাকে নিয়েছেন

কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডে, দু'জন মামাতো ভাইকে বিলেতে পড়িয়ে এনেছেন। শুধু তাঁর মা-ই কোন সুখভোগ করে যেতে পারলেন না। সবেমাত্র এই বেহালার কারখানাটা লীজ নেওয়া হয়েছে, সেই সময় মারা গেলেন মা।

অফিস ঘরে বসে কাগজপত্র দেখছেন জ্ঞানব্রত, হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—শেখর, তুই এই গানটা জানিস? শহরে ষোলজন বোম্বেটে। করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।—

শেখর একেবারে অবাক।

তার মামা অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কাজের মধ্যে কোনো রকম ছ্যাবলামি করবেন তিনি, এ তো কল্পনাই করা যায় না। এ কি একটা বিদঘুটে গানের কথা জিজ্ঞেস করছেন!

—গান? এটা কী গান?

জ্ঞানব্রত হাসলেন।

পুরনো অভ্যেস মতই বাঁ হাতের দুটি আঙুল কাঁচি করে ধরলেন মুখের সামনে, যেন সেখানে রয়েছে অদৃশ্য সিগারেট।

—হঠাৎ এই গানটা শুনলাম রেডিওতে। তারপর অনবরত এটা মাথার মধ্যে ঘুরছে।

—রেডিওতে শুনলেন? কখন?

—আজই খেতে বসে—

নতুন নামকরা শিল্পপতি এবং সদা ব্যস্ত জ্ঞানব্রত চাটার্জি সকাল বেলা খাবার টেবিলে বসে রেডিওতে পল্লীগীতি শুনেছেন—এ দৃশ্যও শেখরের পক্ষে কল্পনা করা দুষ্কর। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা রেডিওর গান নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

—মনে হচ্ছে যেন এই গানটা আমি আগে কোথাও শুনেছি। কোথায় শুনলাম বল তো?

—আমি তো এরকম গান কক্ষনো শুনি নি!

—তোর বাড়িতে ফোন কর তো?

—বাড়িতে?

—হ্যাঁ, তোর মাকে একবার ডাক।

দুই দিদি জ্ঞানব্রতের। বড় দিদি থাকেন ভুপালে। শেখরের মা

ছোড়দি। ছেলেবেলায় খুব সুন্দর গান করতেন। তারপর যা হয় অধিকাংশ বাঙালী মেয়েদের। বিয়ের পর গান বাজনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যায়।

—ছোড়দি, আমি গেনু বলছি।

বয়েসে বড় দিদি হলেও প্রতিমা তাঁর এই ছোট ভাইকে একটু সমীহ করেন! জীবনে এতখানি উন্নতি করেছে সে, তাঁর ছেলেকে বিরাট চাকরি দিয়েছে। এক সময় গেনু বলে ডাকলেও এখন বলেন জ্ঞান।

—কী রে, কী হয়েছে?

– ছোড়দি, তুমি তো এক সময় অনেক গান করতে। তুমি এই গানটা জানো? শহরে ষোলোজন বোম্বাটে—

— না তো!

—ভালো করে ভেবে দেখো, কখনো শোনো নি?

—না। হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস যে?

—এই গানটা আমার মাথায় গেঁথে গেছে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। আগে শুনেছি মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত ছেলেবেলায়।

—সুজাতা কেমন আছে?

—ভালো আছে। তোমাকে সুরটা শোনাবো? তা হলে হয়তো তোমার মনে পড়তে পারে।

অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য! আরও একজন কর্মচারী এই সময় ঘরে ঢুকেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্কাণ্ডালাইজড, শেখরের সেই অবস্থায় গোল্ডেন স্টার টুথপেস্ট কোম্পানির একান্নভাগ শেয়ারের মালিক জ্ঞানব্রত অফিস ঘরে বসে অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ে টেলিফোনে পল্লীগীতির সুর শোনাচ্ছেন দিদিকে। মাথাটা খারাপ হয়ে যায় নি তো? ঘড়ির কাঁটা ধরে এই লোকের জীবন চলে।

প্রতিমা টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না, এই সময় তাঁর কি বলা উচিত। তাঁর ঝোঁক ছিল নজরুল ও অতুল প্রসাদের গানে, সেও কতকাল আগের কথা। এ গান তো তিনি শোনেন নি কখনো। তবু গুরুত্বপূর্ণ ছোট ভাইকে খুশী করবার জন্য তিনি আমতা আমতা করে বললেন:

হ্যাঁ, কেমন যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

—এর পরের কথাগুলো জানো ?

—না। খুশীকে অনেকদিন দেখিনি। একদিন আসতে বলিস না আমাদের এখানে।

উজ্জয়িনীর ডাক নাম খুশী! সে তার মাসীদের ভক্ত পিসীর বাড়ীতে যেতে চায় না।

—আচ্ছা বলবো। তা হলে গানটা তুমি জান না। তোমার কাছ থেকে শুনি নি।

—রাস্তার ভিখিরিরা অনেক সময় এইরকম গান গায়।

টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েই অভ্যাস মতন ঘড়ি দেখলেন জ্ঞানব্রত। ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজে। সুজাতাকে গাড়িটা পাঠাবার কথা ছিল।

এরকম ভুল তার কখনো হয় না।

সুজাতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিলেতে, সেই প্রথমবার জ্ঞানব্রত ও দেশে গিয়েছিলেন। এখন বছরে দু'বার তিনবার তাঁকে বিলেত-আমেরিকায় যেতে হয়। সুজাতা তখন ওখানে পড়াশুনা করছে। আলাপের তৃতীয় দিনেই জ্ঞানব্রত বুঝেছিলেন, এই মেয়েটিকে না পেলে তাঁর চলবে না। প্রথম যৌবনেই ব্যবসা শুরু করে তার মধ্যে একবারে ডুবে গিয়েছিলেন জ্ঞানব্রত, কোনো মেয়ের দিকে তাকাবার সময় পান নি, সুজাতাকে দেখেই তার মনে হয়েছিল যদি বিয়ে করতে হয় তা হলে একেই, নইলে আর কারুকে নয়।

সেবার বিলেতে থাকার কথা ছিল তিন সপ্তাহ, থেকে গেলেন দু'মাস।

কেনসিংটনের একটা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে জ্ঞানব্রত দুম করে সুজাতাকে বলেছিলেন, আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন, তা হলে কাল আমি আসবো, নইলে আজই আমাদের শেষ দেখা।

সুজাতা বলেছিল, আর পাঁচ মাস বাদে যে আমার পরীক্ষা!

—আমি এখানেই বিয়েটা সেরে দেশে ফিরে যাবো। আপনি পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে তারপর ফিরবেন ?

—কেন, আমি দেশে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না ?

—না।

—এত অধৈর্য কেন আপনি ?

—আমি চলে গেলেই আমার চেয়ে যোগ্য কেউ আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলতে পারে।

সুজাতা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার ধারণা ছিল, যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে, তারা পরস্পরকে তুমি বলে। এ রকম গুরুগম্ভীর ভাষায় কেউ যে কখনো বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা আমি জন্মে ভাবি নি।

আসলে জ্ঞানব্রত লাজুক। ব্যবসায়ীদের জগতে তিনি গম্ভীর মানুষ বলে পরিচিত, সেটা লাজুকতারই একটা দিক। সুজাতাকে বিয়ের দিন পর্যন্ত 'আপনি'র বদলে তুমি বলতে বাধো বাধো ঠেকেছে!

তক্ষুণি নিজের গাড়িটা সুজাতাকে পাঠিয়ে দিয়ে কারখানার একটা গাড়ি নিয়ে তিনি চলে এলেন স্টাফেন কোর্টে তাঁর অফিসে।

বিকেল পর্যন্ত সেই গানটা তার সঙ্গ ছাড়লো না। যতই কাজে মন দেবার চেষ্টা করেন, সেই গানটা তাঁর মাথায় ঘুরে ফিরে আসে। এখন তার মনে বদ্ধমূল জন্মে গেছে যে এই গানটা তিনি পুরো শুনেছেন তো নিশ্চয়ই, শুধু তাই নয়, পুরো গানটাই তিনি জানতেন। কিন্তু কার কাছে যে শুনেছেন তা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

অফিস ঘরে সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব বাথরুম। বিকেলে সেখানে ঢুকে তিনি দিব্যি গুনগুনিয়ে গাইতে লাগলেন গানটা ঃ

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে

করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে

তারপর ? তারপর ?

জ্ঞানব্রত অনুভব করলেন এই গানটার বাকি কথাগুলো না জানতে পারলে তাঁর জীবনে আর সুখ আসবে না। রাত্তিরে ঘুমোতেও পারবেন না তিনি।

কিন্তু এ গান কী করে উদ্ধার করা যাবে? সকালবেলা কোন এক অখ্যাত গায়ক রেডিওতে গেয়েছে এই গান। কে তা শুনেছে বা মনে রেখেছে? অন্তত জ্ঞানব্রত যে জগতে ঘোরাফেরা করেন সেখানকার কেউ শুনবে না এই গান।

ফোন তুলে জ্ঞানব্রত চাইলেন আর সি চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাম্বার!

—রশীদ সাহেব? আমি জ্ঞানব্রত চৌধুরী বলছি। টোকিও থেকে কবে ফিরলেন?

—এই তো পরশু। আপনার জন্য একটা ঘড়ি এনেছি। আমার গরীবখানায় কবে আসবেন বলুন? নেক্সট সানডে?

—না, ঐ রবিবার আমি থাকবো না, পরে হবে একদিন। আপনাকে অন্য একটা দরকারে ফোন করছি। আপনার বাড়ির পার্টিতে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, কলকাতা রেডিও স্টেশনের নতুন স্টেশান ডিরেকটার, কি যেন নাম ভদ্রলোকের?

—এই রে, নাম তো জানিনা আমিও। কেন, খুব দরকার?

—আপনার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন, আপনি তার নাম জানেন না?

—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ, ওনার ওয়াইফের খুব বন্ধু। এক সঙ্গে পড়তেন কলেজে। সেইজন্য আপনার ভাবীই নেমন্তন্ন করেছিলেন ওদের দু'জনকে। নামটা বলেছিলেন বটে, এখন ভুলে গেছি।

—আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে নামটা জানা যায় না?

—কেন যাবে না? হঠাৎ রেডিওর স্টেশন ডিরেকটারকে আপনার কী দরকার পড়লো? পাবলিসিটি দেবেন?

—না, না, সে সব কিছু নয়, অন্য একটা দরকার।

দশ মিনিট বাদে রশীদ সাহেব জানিয়ে দিলেন যে রেডিও স্টেশনের ঐ পরিচালকটির নাম পি সি বড়ুয়া।

এবার জ্ঞানব্রত চাইলেন রেডিও স্টেশন।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রশীদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে মনে করতে পারছেন তো?

—নিশ্চয়ই। গোল্ডেন স্টার টুথপেস্ট তো? আমেরিকাতে আমি যখন পড়াশুনো করতুম, তখন থেকেই ঐ টুথপেস্ট ব্যবহার করি।

—আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার ছিল।

—বলুন।

ঠিক মুহূর্তে সামলে গেলেন জ্ঞানব্রত। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! তাঁর পক্ষে রেডিওর স্টেশন ডিরেক্টরকে টেলিফোন করে

হঠাৎ একটা পল্লীগীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা একেবারেই চলে না। মাষ্ট নট ডন।

—আপনি আজ সন্ধেবেলা কি ব্যস্ত আছেন? ক্যালকাটা ক্লাবে একবার আসতে পারবেন?

—ক'টার সময়?

—এই ধরুন সাড়ে সাতটা-আটটা?

—আচ্ছা আসবো। এই ধরুন এইটস! আপনি কোথায়—

—আমি ওপরের বার রুমে থাকবো।

—ঠিক আছে দেখা হবে। আমার স্ত্রী সেদিন বলছিলেন আপনার স্ত্রীর হাসিটি একেবারে গোল্ডেন স্টার স্মাইল। হাঃ হাঃ হাঃ।

জ্ঞানব্রত চিন্তা করে দেখলেন আজ সারা দিনে তিনি প্রায় কিছুই কাজ করেননি তিনি। কী একটা সামান্য গান তাঁকে একেবারে পাগলা করে তুলেছে। আজ এর একটা হেস্ত নেস্ত করে করে পুরো ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার।

ঐ বোম্বেটে শব্দটা! জ্ঞানব্রতর যেন মনে হচ্ছে এই গানেই তিনি প্রথম বোম্বেটে শব্দটা প্রথম শোনেন। শহরে ষোলোজন বোম্বেটে···এ লাইনটার নিশ্চয়ই অন্য কোন মানে আছে। পুরো গানটা শুনলেই তা বোঝা যাবে।

সুজাতাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন, আজ তাঁর ফিরতে দেরি হবে।

রেডিও'র ষ্টেশন ডিরেক্টর ক্যালকাটা ক্লাবে আসবেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাঝখানে অনেকটা সময়। জ্ঞানব্রত সাধারণত দু'টোর পর অফিসে থাকেন না। এক একজন লোক দিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই অফিসে কাটাতে ভালোবাবাসে। খুব বেশী কাজের চাপ থাকলে জ্ঞানব্রত ফাইল পত্র বাড়িতে নিয়ে যান কিংবা ম্যানেজারদের বাড়িতে ডাকেন। তার বাড়িতে এ জন্য দু'খানা আলাদা ঘর আছে।

সন্ধ্যের সময় অফিসের বদলে বাড়িতে বসে কাজ করার একটাই কারণ, খুব বেশীক্ষণ সুট টাই মোজা জুতো পায় থাকা পছন্দ করেন

না তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এই সব ধড়া-চুড়ো ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবী আর চটি পরলেই স্বস্তি।

আজ আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হবে না। এখন বাড়ি ফিরে আবার ক্যালকাটা ক্লাবে আসা একটা ঝক্কির ব্যাপার। জ্ঞানব্রত এখন বেশ লজ্জা পাচ্ছেন। কেন পি, সি বড়ুয়াকে ডাকতে গেলেন। কি বলবেন তিনি ওঁকে? হটাৎ এরকম ছেলেমানুষ কেন বা চাপলো কে জানে।

চেয়ার ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন জ্ঞানব্রত। সাত তলায় ওপরের এই ঘর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঐতো কাছেই রেডিও স্টেশন! তিনি ইচ্ছে করলেই ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারতেন বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে। কিংবা ওঁকে বললে পারতেন, অফিস থেকে ফেরার পথে টুক করে দু'মিনিট থেমে যাবেন এখানে। কিন্তু সেটা রীতি নয়। অল্প পরিচিত হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিদের ক্লাবে ডাকাই নিয়ম।

ডালহাউসি স্কোয়ারের চার পাশ এখন লোকে লোকারণ্য। ওপর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বুঝি কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে গেছে। সে সব কিছুই নয়, অফিস ছুটির সময় এ রকম ভিড়ই হয়।

অন্য দিনের মত ঠিক ছ'টার সময় বেরোলেন জ্ঞানব্রত।

সুজাতা বিকেলের দিকে আবার গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। না দিলেও অসুবিধে ছিল না। অফিসের অন্য যে-কোন একটা গাড়ি নিতে পারতেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়ালেন। ভেতরে উঠে বসে তিনি বললেন, ইডেন গার্ডেনের দিকে চলো।

শিক্ষিত ড্রাইভার কখনো বিস্ময় প্রকাশ করে না।

সন্ধের সময় বড়বাবু ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে যাবেন, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু সে কোনো কথা না বলে সেদিকেই গাড়ি ঘোরালো।

এক্ষুণি ক্যালকাটা ক্লাবে যেতে চান না জ্ঞানব্রত। সেখানে চেনা শুনো অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। এই সময় যারা যায় তারা মদ খেতেই যায়। তাদের পাল্লায় পড়লে তাঁকেও মদের গ্লাস নিয়ে বসতে হবে। কিন্তু তাঁর মদ খাওয়ার প্রতি বিশেষ ঝোঁক নেই, মাঝে মাঝে দু'তিন পেগ খান বটে। খুব একটা উপভোগ করেন না।

পি, সি বড়ুয়াকে তিনি বার রুমে আসতে বললেন কেন? খেতে বসলে তো ড্রিংক না নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিছু না ভেবেই তখন বলেছেন। এখন বুঝলেন একটা কারণও আছে। রশীদ সাহেবের বাড়িতে পার্টিতে তিনি পি, সি বড়ুয়াকে ঘন ঘন স্কচ নিতে দেখেছিলেন।

ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম গেটটার সামনে গাড়িটা থেমে গেল। জ্ঞানব্রতকে অন্যমনস্ক ড্রাইভার শুধু বললো, স্যার— ।

সময় কাটাবার জন্য ইডেন গার্ডেনে তিনি ঘুরে বেড়াবেন? সেটা হাস্যকর। ওখানে অল্প বয়েসী ছেলে মেয়েরা যায়। অন্তত পঁচিশ বছরের মধ্যে জ্ঞানব্রত ইডেন গার্ডেনের এইদিকটায় সন্ধ্যেবেলা একবারও আসেনি। ক্রিকেটের সময় দুপুরে আসতেন বটে, তাও সারা দিনের পুরো খেলা কোনোবারই দেখা হয় নি।

তার চেয়ে গঙ্গার ধারে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালে হয়। শীতের বেলা, এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জ্ঞানব্রতর মনে পড়লো অনেক-দিন তিনি কোনো নদী দেখেন নি।

ড্রাইভারকে বললেন তুমি এখানে থাকো। আমি আসছি।

স্ট্যান্ডের কাছটায় যে এমন সুন্দর সব ফুলের গন্ধ আর এরকম বাঁধানো রাস্তা হয়েছে জ্ঞানব্রত জানতেনই না। অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। এমন কি তার বয়সী লোকও রয়েছে।

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে জ্ঞানব্রত আপন মনে গুনগুন করে সেই গানটা গাইতে লাগলেন :

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা
সব লুটে—

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবলেন, আমার কি মাথা একে-বারে খারাপ হয়ে গেল? এ কী গান আমি গাইছি? এ গানটা সারা দিন আমার মাথায় গেঁথে আছে কেন? এর মধ্যে কী যাদু আছে? ট্রেনের ভিখিরি কিংবা বাউল-টাউলরা এরকম গান গায়, এর সঙ্গে গোল্ডেন স্টার টুথ পেস্ট কোম্পানীর মালিকের কী সম্পর্ক!

একটু বিরক্ত মুখে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন।

বড় বড় কয়েকটা জাহাজ আলোকমালায় সাজানো। ছোট ছোট অনেকগুলো নৌকা মোচার খোলার মতন দুলছে, এই মাত্র একটা স্টীমার জলে ঢেউ তুলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ ডেকে চলে গেল। এই গানটার সঙ্গে জ্ঞানব্রতর ছেলেবেলার কোন যোগ আছে নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রতর খুব ভালো মনে পড়ে না ছেলেবেলার কথা। চৌদ্দ বছর তিন মাস বয়সে তার বাবা মারা যান। তারপর থেকে সব স্মৃতিই খুব স্পষ্ট, কিন্তু বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন তার আগের দিনগুলো যেন হারিয়ে গেছে একেবারে। অথচ সেই সবই ছিল সুখের দিন। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁদের সংসারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় জ্ঞানব্রতর গাড়ি থামলো ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে।

এখনো তাঁর অন্যমনস্ক ভাবটা যায়নি। কোনো দিকে না তাকিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে, হঠাৎ প্রায় মুখোমুখি একজন দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বললো, হ্যাল্লো জি! বি! সিয়িং ইউ আফটার আ লং টাইম! একা যে?

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে একটি বেশ দীর্ঘকায় মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিকে দেখলেন। তার পাশে এক ছিপছিপে চেহারার তরুণী মেয়ে। পুরুষটিকে চেনেন জ্ঞানব্রত, কনসালটেন্সি ফার্ম আছে। জ্ঞানব্রত ব্যবসা শুরু করার পর গোড়ার দিকে কিছুদিন এর সাহায্য নিয়েছিলেন, এখন বিশেষ যোগাযোগ নেই, তবে তিনি শুনেছেন পান বাজারে এর অনেক টাকা ধার।

জ্ঞানব্রত ফিকে হাসির সঙ্গে বললেন, কী খবর পি, সি?

—খবর তো অনেক। আমরা চলে যাচ্ছিলুম ··চলুন তাহলে আপনার সঙ্গে আর একটু বসি। জি. পি, আপনি খানিকটা রিডিলস করেছেন মনে হচ্ছে। ইউ লুক ইয়াং।

উঁচু মহলে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না। নামের ইংরাজী দুটি আদ্যক্ষর বলাই রেওয়াজ। জি, পি, সি, আর, এস, পি, কে। যেন মানুষ নয়, কোনো গুপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, পি, সি নামের লোকটি এরই মধ্যে বেশ খানিকটা নেশা করেছে। ওর সঙ্গে টেবিলে বসে কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই তাঁর। কিন্তু লোকটি নিজে থেকে নেমন্তন্ন করেছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, আমার সঙ্গে একজনের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। অকারণেই হা হা করে হেসে উঠে পি, সি বললো, কোনো গোপন ব্যাপার? কোনা পরস্ত্রী? আমরা সেখানে থাকলে অপরাধ হবে?

তারপর হঠাৎ মনে-পড়া ভঙ্গিতে পি, সি তার পাশের মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, আলাপ করিয়ে দিই, মীট্ মাই কাজিন, এলা। এই মেয়েটির নাম হল ··ইয়ে—মানে—কী যেন পদবী তোমার, কিছুতেই, মনে থাকে না।

মেয়েটি বললো, মুখার্জি। এলা মুলা মুখার্জি।

পি, সি, নামের লোকটি তার এমনই কাজিনকে সঙ্গে এনেচে, যার পদবীও সে জানে না। আজকাল এরকম বাজে মিথ্যে কথা বলার দরকার হয় না। ঐ পি, সি, যে-কোনো মেয়ের সঙ্গেই ক্যালকাটা ক্লাবে এসে থাক না কেন, তাতে জ্ঞানব্রতর কি আসে যায়?

তলা থেকে আরও লোক আসছে, এই সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না· জ্ঞানব্রত ওপরে উঠতে শুরু করতেই পি, সি, আর এলা মুখার্জি এ লা সঙ্গে সঙ্গে।

কোণের একটা টেবিলে বসবার পর পি, সি, জ্ঞানব্রতকে বললো, আই উইল হ্যাভ ওয়ান স্কচ অন ইউ। এলা কী খাবে আপনি জিজ্ঞেস করুন ইউ ক্যান অফার হার হোয়াট এভার ইউ লাইক।

এলা বললো সে আগে জিন আর লাম খেয়েছে, এখনও তা-ই খাবে।

বয়কে ডেকে মৃদু কণ্ঠে হুইস্কি, জিন এবং নিজের জন্য মিনারাল ওয়াটার অর্ডার দিলেন জ্ঞানব্রত।

এলার কাঁধে আলগা হাত রেখে পি, সি, বললো, জানো তো এলা, এই জি, বি, নাও আ ভেরি বীগ ম্যান—কিন্তু এক সময় ছিল, আমার কাছে আসতে হতো, আমি ব্যাঙ্ক লোন পাইয়ে দিয়েছি। জী, বি, দিই নি? ঠিক বলছি?

পি, সি'র উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। এক সময়ে জ্ঞানব্রতর উপকার

করেছে। এখন তার প্রতিদান চায়। দু'চার পেগ স্কচ খাওয়াবে, এ আর এমন কী! কিন্তু এরকম প্রতিদান যে সে অনেকবার নিয়েছে, তা এলা জানে না।

জ্ঞানব্রত কৃপণ নন, পি, সি-কে খাওয়াতে তাঁর আপত্তি নেই। তা ছাড়া এই সব খরচই যাবে তাঁর এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে। কিন্তু তিনি জানেন, একবার নেশা হয়ে গেলে, পি, সি, আর থামতেই চাইবে না।

এলা মেয়েটি খুবই সুশ্রী। মুখে বুদ্ধির আভা আছে। পি, সি'র সঙ্গে তার বয়সের অনেক তফাৎ, অন্তত তিরিশ বছর তো হবেই। এইসব মেয়েকে মদ্যপানের সঙ্গিনী হিসাবে পি, সি, জোগাড় করে কী ভাবে? এই সব মেয়েরাই বা আসে কেন?

এলা নিজের হাতব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের পাকেট আর লাইটার বার করলো। দু'টোই বেশ দামী। তারপর জ্ঞানব্রতর দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমি আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি?

জ্ঞানব্রত অবাক না হয়ে পারলেন না। তার সামনে মদ খেতে পারে, অথচ সিগারেট ধরাতে লজ্জা, এ আবার কী ধরনের মেয়ে?

জ্ঞানব্রত কিছু বলবার আগেই পি, সি, বলে উঠলো আরে খাও, খাও। জি, বি; কিছু মনে করবে না। বছরে দু'তিনবার লণ্ডন আমেরিকা যায়। এলা বললো, না আমি ওকে আগে থেকেই চিনি কিনা।

—আপনি আমাকে চেনেন?

—আমাকে আপনি, বলছেন কেন? পি, সি, আবার মাঝখানে বলে উঠলো ওকে 'অ্যাপনি' বলার কী আছে? জি, বি,ইউ আর সো ফরমাল···

জ্ঞানব্রতর মনে হলো, এখন পি, সি, না থাকলেই ভালো হতো। এলা নামের এই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ভালো লাগতো। এক একটি মেয়ে থাকে, যাদের মুখের দিকে তাকালেই ভালো লাগে, এলা সেই রকম।

—তুমি আমায় আগে থেকে চেনো?

—হ্যাঁ, একবার দেখেছি। আপনি তো উজ্জয়িনীর বাবা!

উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমি বেথুনে পড়েছি এক বছর। তখন একবার আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

জ্ঞানব্রত স্পষ্ট টের পেলেন, তার শরীরটায় ঝনঝন শব্দ হলো। এই মেয়েটি তার মেয়ে উজ্জয়িনীর সহপাঠিনী? পি সি'র মতন একজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের সঙ্গে ঘোরে। তার সামনে বসে মদ খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্চে তাঁর মেয়ের বান্ধবী, উজ্জয়িনীর কত বয়েস? কয়েক মাস আগেই ওর কুড়ি বছরের জন্মদিন গেল না? এই মেয়েটির বয়েসও তা হলে কুড়ি একুশ। তবে কি উজ্জয়িনীও অন্য কোথাও অন্য কারুর সঙ্গে এইভাবে·· না না তা হতেই পারে না!

দু'এক মুহূর্ত আগে জ্ঞানব্রত ছিলেন পুরুষ মানুষ এখন হয়ে গেলেন বাবা। তার মেয়ের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হতে লাগল, উজ্জয়িনী অনেক স্বাধীন হয়ে গেছে, যখনতখন বাড়ি থেকে বেরিয়েযায়—জ্ঞানব্রত তেমন খবর রাখতে পারেন না।

এলা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, উজ্জয়িনী এখন এম. এ পড়ছে না? আমি আর এম. এটা পড়লাম না।

তৎক্ষণাৎ সস্তা রসিকতার সুরে পি, সি বললো, তার বদলে প্রেমে পড়ে গেলে! হাঃ-হাঃ-হা.।

জ্ঞানব্রত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। এলার দিকে তিনি আর তাকাতেও পারছেন না।

এলা বললো, কলেজে আমরা একবার 'তাসের দেশ করেছিলুম, উজ্জয়িনী হরতনী সেজেছিল, আপনি দেখতে গিয়েছিলেন?

জ্ঞানব্রত দুদিকে মাথা নাড়লেন।

—আমি হরতনীর গান গেয়েছিলুম পেছন থেকে।

পি সি, বললো, খুব ভাল গান গায়। জি, বি'র অবশ্য গানটান শোনার সময় নেই, সেকিং মানি অল দা টাইম—

গান কথাটা শোনামাত্র জ্ঞানব্রতর আবার মনে পড়ল সেই লাইন-গুলো—শহরে ষোলজন বোম্বেটে—করিয়ে পাগলপারা—নিল তারা সব লুটে—।

পি. সি বললো. বাংলা সিনেমায়, রেডিওতে আজকাল যা বাজে

গান হয়, সেই তুলনায় এলা—শি ইজ আ ওয়ান্ডার···এমন চমৎকার গলা ?

—চুপ করো ! তুমি বড় বাড়িয়ে বলছো ।

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে তাকালেন। এলা তুমি বলে কথা বলে পি, সি'র সঙ্গে। এই মেয়েটির পশ্চাৎপটটা তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাসও তাঁর নেই।

পি, সি'র গেলাস খালি হয়ে গেছে। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই সে বললো, হ্যাঁ দাও আর একটা।

এলা আর নিতে চাইলো না। সে বললো, আমি এবার উঠবো। তা ছাড়া উনি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন, আমরা শুধু শুধু ডিসটার্ব করছি ওঁকে—

এক্ষেত্রে ভদ্রতা করে জ্ঞানব্রতর বলা উচিত, না না, সে রকম কোনো ব্যাপার নয় ইত্যাদি। কিন্তু সে সুযোগও তিনি পেলেন না, তার আগেই পি, সি বলে উঠলো, আরে যাঃ। জি, বি-কে কি আমি আজ থেকে চিনি ? এতকালের সম্পর্ক ! সার্টেইনলি হি ওন্ট মাইন্ড···তোমার মত একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখেও বিরক্ত হবে, কী, জি, বি ?

জ্ঞানব্রতর বললেন, মাই প্লেজার !

পরের গেলাসে দু'চুমুক দিয়েই পি, সি বললো আমি একটু আসছি। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

এবার জ্ঞানব্রত আর এলা মুখোমুখি। জ্ঞানব্রত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

—আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না।

জ্ঞানব্রত একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ?

—আপনার মাথায় এত চুল, একটাও পাকে নি।

—ও বয়েস !

—এখনো খুব ইয়াং আছেন।

এলার হাসিটা দেখে আরও চমকে উঠলেন জ্ঞানব্রত। কম বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেলামেশার অভ্যেস না থাকলেও এ হাসি দেখলে চিনতে ভুল হয় না। প্রশ্রয়ের হাসি। পি, সি'র অনুপস্থিতিতে

এলা তাঁকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে। তাঁর নিজের সমবয়েসী একটি মেয়ে...

জি, ই, সি কোম্পানির চৌধুরী এই সময় বার-রুমে ঢুকে জ্ঞানব্রতকে দেখে কথা বলার জন্য এগিয়ে এসে থমকে গেলেন হঠাৎ। তারপর দ্রুত চলে গেলেন উনি। এরকম ভর সন্ধেবেলা ক্যালকাটা ক্লাবে কোনো যুবতী মেয়েকে নিয়ে মদের টেবিলে বসে থাকবেন জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী এ রকম যেন কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

জ্ঞানব্রত মনে মনে একটু হাসলেন। চৌধুরী বোধহয় ভাবলেন, রাতারাতি তার চরিত্র পালটে গেছে।

কী মুস্কিল, পি সি আসছে না কেন? বাথরুম করতে এত দেরী হয়? নিশ্চয়ই আর কারুর সঙ্গে গল্প মেতে গেছে।

কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়, তাই জ্ঞানব্রতর কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাকো?

—গোল পার্কে। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে।

—হোস্টেলে? তুমি চাকরী করো?

—করতাম। এখন করি না।

পর মুহূর্তেই এলা ঝরঝর করে হেসে বললো ভয় নেই, আপনার কাছে চাকরি চাইবো না। আমার গান বাজনা নিয়ে থাকার ইচ্ছে। আপনি গান ভালোবাসেন না?

—খুব যে ভালোবাসি কিংবা বুঝি, তা বলতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে শুনি।

—সামনের সপ্তাহে থেকে যে হাফেজ আলীর নামে কনফারেন্স হচ্ছে, তাতে যাবেন? আমি যেতে পারি আপনার সঙ্গে।

একটু গম্ভীর হয়ে জ্ঞানব্রত বললে. সামনের সপ্তাহে আমার কলকাতায় থাকা হবে না। বোম্বে যেতেই হবে।

—বাবা! আপনারা সব সময় এত ব্যস্ত!

—তুমি কী গান করো? পল্লীগীতি কিংবা পুরো বাংলা গান? জানো?

—ফোক সঙ? না ওসব আমি করি না আমি নজরুল অতুল প্রসাদের গান— রবীন্দ্র সঙ্গীতও শিখেছি। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের

এত আর্টিস্ট যে চান্স পাওয়া যায় না।

এবার রেডিও স্টেশনের বড়ুয়া দরজা দিয়ে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। জ্ঞানব্রত হাত তুললেন।

বড়ুয়া এলার দিকেই তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। বড়ুয়া জ্ঞানব্রতর প্রায় সমবয়সীই মনে হয়, মাথার চুলে কিছু পাক ধরেছে। কিন্তু জ্ঞানব্রতর তুলনায় বড়ুয়া অনেকটা চটপটে ধরনের মানুষ। এদের আদি বাড়ি চট্টগ্রামে, তবে এখন নিজেকে অসমীয়া বলে পরিচয় দেন।

পাক্কা সাহেবের মতন সুট-টাই পরা বড়ুয়ার। বসেই কোটের দুপকেট থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন, আই আমি স্লাইটলি লেট—আটটা দশ—এই যাঃ সিগারেট আনতে ভুলে গেলাম!

টেবিলের ওপর এলার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পড়ে আছে। বড়ুয়া ধরেই নিলেন সেগুলো জ্ঞানব্রতর। তিনি সেদিকে অন্যমনস্ক-ভাবে হাত বাড়াতেই জ্ঞানব্রত বললেন, আমি সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি আপনার কী ব্র্যান্ড

এলা বললো, নিন না!

এবার আলাপ করিয়ে দিতে হয়। জ্ঞানব্রত বললেন, ইনি মিস এলা মুখার্জি, গান করেন, আর ইনি এন সি বড়ুয়া কলকাতা রেডিওর।

বড়ুয়ার চোখে বেশ খানিকটা কৌতূহল ফুটে উঠলো। তিনি একবার এলার মুখের দিকে, একবার, জ্ঞানব্রতর দিকে তাকাতে লাগলেন। ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না।

এরকম অদ্ভুত অবস্থায় জ্ঞানব্রত কখনো পড়েন নি। ঝোঁকের মাথায় বড়ুয়াকে তিনি এখানে ডেকেছিলেন। বড়ুয়া নিশ্চয়ই একটা কিছু কারণ জানতে চাইবেন। অন্তত মনে মনে। কিন্তু কী কারণ দেখাবেন জ্ঞানব্রত? যা বলতে চান তাও এখন বলা যাবে না। এলাকে নিয়ে তিনি বসে আছেন। এলা গান গায়। বড়ুয়া হয়তো ভাববেন এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জনাই তাঁকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মেয়েটিকে জ্ঞানব্রত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেও চিনতেন না। তা কি বিশ্বাস করবেন?

এরপরই এসে পড়লো পি সি।

জ্ঞানব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলা হবে না, কোন কথাই বলা হবে না আজ। অনাবশ্যক অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছেন।

তার ইচ্ছে হলো, কারুকে কিছু না বলে হঠাৎ এখান থেকে উঠে চলে যেতে।

সে রাতে জ্ঞানব্রত বাড়ি ফিরলেন এগারোটার পর, এবং বেশ মাতাল অবস্থায়। এটা একটা অভিনব ঘটনা।

সুজাতা অবাক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিলিতি শিক্ষা অনুযায়ী মুখে সে ভাব ফোটালো না। কোনো এক ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকের লেখায় সুজাতা পড়েছিল যে, যারা প্রকৃত লোভী, তারা কোন কিছুতেই চট্ করে অবাক হয় না।

কেন দেরী হলো, কাদের সঙ্গে ছিল এসব কিছুই জিজ্ঞেস করলো না সুজাতা। শুধু জানতে চাইলো, তুমি রাত্রে আর কিছু খাবে?

জ্ঞানব্রতর চক্ষু দুটি লাল, চুল এলোমেলো, টাইয়ের গিট আলগা। সারা মুখে একটা জ্বলজ্বলে ভাব। মাথা নেড়ে বললেন, না।

স্বামী স্ত্রীর একই শয়ন কক্ষ বটে কিন্তু আলাদা দুটি খাট। ঘরটি বেশ বড়। খাট দুটি দুদিকের দেয়ালে পাতা। এই ব্যবস্থা এই জন্য যে সুজাতা অনেক রাত জেগে উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। জ্ঞানব্রত ঘুমিয়ে পড়েন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় এবং চোখে আলো তাঁর সহ্য হয় না। সুজাতার খাটের সঙ্গে একটা ছোট্ট আলো লাগানো আছে বই পড়বার জন্য।

সুজাতা বললো, তুমি অ্যাসপিরিন বা অ্যাণ্টাসিড জাতীয় কিছু ওষুধ খাবে।

জ্ঞানব্রত প্রথমে দু'দিকে ঘাড় নাড়লেন। তারপর এক মুখ হেসে শিশুর মতন আবদারে গলায় বললেন, একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। দেবে?

এতেও বিস্মিত ভাব দেখালেন না সুজাতা।

আজ এরকম পরপর নিয়মের ব্যতিক্রম করছেন জ্ঞানব্রত।

এক সময় তাঁর মুখে সিগারেট কিংবা চুরুট সব সময় লেগে থাকতো। সাত মাস আগে একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার অবশ্য অনেক পরীক্ষা করেও হার্টের কোনো রোগ ধরতে

পারেন নি। তবে সাবধান হওয়া ভালো। সিগারেট চুরট এসব ছাড়া দরকার।

সিগারেটের অভ্যাস ছাড়া পৃথিবীর বহু লোকের পক্ষে খুব শক্ত হলেও জ্ঞানব্রতর কাছে কিছুই না। সেই যে চুরুটের বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়, তারপর থেকে এই সাত মাসের মধ্যে একবারও ভুলেও ধূমপানের ইচ্ছে প্রকাশ করেন নি ; তাঁর যেমন কথা, তেমন কাজ।

এক সময় মুখে দুটো সিগারেট এক সঙ্গে নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে জ্ঞানব্রতর তার একটা দিতেন সুজতাকে। বিয়ের পর কিছুদিন রাত জেগে গল্প করার সময় দুজনে পাশাপাশি বসে এক প্যাকেট সিগারেট উড়িয়ে দিতেন।

সুজাতা সিগারেটের অভ্যাস ছাড়তে পারে নি।

স্বামীর দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আই থিংক, ইউ বেটার নট।

— খাই না একটা !

আগেকার মতন আর এক সঙ্গে দুটো সিগারেটে জ্বালালেন না জ্ঞানব্রত। শুধু নিজেরটা ধরিয়ে বললেন, আজ একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছে। একটা গানের কটা লাইন এমন মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। এমন কি এতখানি মদ গিলে ফেললুম, তাও যাচ্ছে না ?

— কী গান ?

একটা হেঁচকি উঠতেই প্রথমে মুখে হাতচাপা দিয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সরি। তারপর উঁ উঁ করে সুর ভেজে গেয়ে উঠলেন ঃ

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে—
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরোমণি ···

এমনিতেই জ্ঞানব্রতর গলায় খুব একটা সুর নেই, মাতাল অবস্থায় তার গলাটা আরও মজার শোনাচ্ছে।

সুজাতা হেসে ফেলে বললো, বাঃ বেশ গানটা তো

—পরের লাইনগুলো মনে পড়ছে না।

—এটা কার গান ?

—কী জানি ! আমি কি গান বাজনার কোনো খবর রাখি ? তবু এই একটা অদ্ভুত গান যে কেন মাথায় ঢুকে গেল—

—এবার শুয়ে পড়ো, ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জ্ঞানব্রত ধড়াচুড়ো ছেড়ে রাতের শোবার পোষাক পরতে লাগলেন। যথেষ্টই নেশা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর পা কেঁপে যাচ্ছে।

—আচ্ছা সুজাতা তুমি এই গানটা আগে শুনেছো ?

—না !

অথচ আমার মন বলে আমি আগে এটা অনেকবার শুনেছি। তা কী করে সম্ভব ?

সুজাতার খাটের ওপর একটা বই অর্ধেক উল্টোনো। বেলজিয়ান লেখক জর্জ সিমেনোর সে নিদারুণ ভক্ত। গোয়েন্দা উপন্যাসের অর্ধেকটা যার পড়া হয়েছে, তার কেন সেই সময় একটা আজেবাজে গান সম্পর্কে আলোচনা শুনতে ভালো লাগবে ?

—তুমি শুয়ে পড়ো, আমি আসছি। সুজাতা চলে গেল বাথরুমে।

টুথপেষ্ট কোম্পানি মালিকের স্ত্রী বলেই নয়, রাত্রে শোবার আগে দাঁত ব্রাস করা সুজাতার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। টুথপেষ্ট কোম্পানির মালিক স্বয়ং অবশ্য রাত্রে দাঁত মাজেন না। শুধু তাই নয়, দাঁত মাজার পর টুথ পেষ্টের গন্ধমাখা মুখ চুমু খেতেও তাঁর ভালো লাগে না। সুজাতা তার স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আজ আর তাঁর চুমু খাওয়ার কোনো বাসনা নেই।

সুজাতা ফিরে এসে দেখলো জ্ঞানব্রত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন জানালার কাছে।

—প্রায় বারোটা বাজলো, তুমি ঘুমোবে না ?

—হ্যাঁ, এবার শুচ্ছি। অনেক দিন কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় নি। চলো এবার কোনো গ্রামে বেড়াতে যাই। যাবে ?

—তুমি যে বলেছিলে সামনের দু' তিন মাসে তোমার খুব বেশী কাজ ? হায়দ্রাবাদে একটা ফ্যাক্টরি খোলা হবে··

হ্যাঁ, কাজ আছে তো বটেই—কিন্তু মন টানছে এমন কোথাও যাই, যেখানে সবুজ গাছপালা, একটা বেশ নির্জন নদী।

সুজতার কাছে গ্রাম মানে ট্রেনের দু'ধারের দৃশ্য। শান্তিনিকেতনের চেয়ে কোনো ছোট জায়গায় সে জীবনে থাকে নি। সাদা টালি বসানো বাথরুম যেখানে নেই, সে সব জায়গা সুজাতার পক্ষে বাসযোগ্যই নয়। সুজাতার পক্ষে এবং সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই এই ভাবটা রয়েছে যে, এই পৃথিবীতে সে অবিমিশ্র সুখ ভোগের জন্যই এসেছে।

কেনই বা সুখ ভোগ করবে না। একটাই জীবন?

—তুমি যদি সময় করতে পারো, চলো তা হলে একবার শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে আসি। চুমকিও বলছিল....

—আগেরবার শান্তিনিকেতন গিয়ে তোমার ভালো লাগে নি।

—যা গরম ছিল সেবার, টুরিষ্ট লজের যে ঘরটা আমাদের দিয়েছিল, এয়ারকুলারটা কোন কাজ করছিল না।

– হা-হা-হা-হা।

জ্ঞানব্রত কাছে এগিয়ে এসে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরলেন। সুজাতা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতেই তিনি বললেন, না, ভয় নেই, চুমু খাবো না, তুমি কি সুন্দর, সুজাতা! তুমি স্বর্গের মানুষ। এই পৃথিবীর নও, গুড নাইট।

নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেও তক্ষুনি ঘুম এলো না জ্ঞানব্রতর। ক্যালকাটা ক্লাবের সন্ধ্যেটার কথা মনে পড়তে লাগলো। এলা নামের মেয়েটি কী অদ্ভুত! তার মেয়ের প্রায় সমান। চুমকির সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছে। সেই মেয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে মদ খায় শুধু না, স্পষ্ট তাকে সিডিউস করার চেষ্টা করেছে স্থির। দৃষ্টি মেলে ঠোঁট কাঁপাচ্ছিল।

এলার ব্যাপারটা সুজাতাকে বলা হয়নি বলে জ্ঞানব্রত একটু অপরাধীবোধ করবেন। স্ত্রীর কাছে কোন কিছু লুকানো তাঁর স্বভাব নয়। তাঁর কোনো গোপন জীবন নেই। থাক, পরে বললেও চলবে।

মাঝরাতে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন জ্ঞানব্রত। তিনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। এখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। তারপর ভালো করে চোখ মেলে দেখলেন সুজাতার খাটে তখনও আলো জ্বলছে, আর কয়েক পৃষ্ঠা বাকি বইটার। সুজাতা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, লালন ফকির ?

শব্দ শুনে এদিকে তাকিয়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার উঠলে যে, জল খাবে ?

জ্ঞানব্রত বললেন, এবার মনে পড়েছে। ওটা লালন ফকিরের গান।

এবার সুজাতা অবাক না হয়ে পারলো না। সামান্য একটু ভুরু তুলে বললো, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঐ গানটার কথা ভাবছো ?

—হ্যাঁ, একটি স্বপ্ন দেখলুম—ছেলেবেলায় এই গানটা আমি প্রায়ই শুনতুম এক বুড়োর মুখে · আমি জানি এটা লালন ফকিরের গান—

সুজাতা অনেকগুলো বছর বিদেশে কাটিয়েছে। বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে তার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই। তবে ফ্যাসান অনুযায়ী সে রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে উপযুক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ফিল্ম দেখে। লালন ফকিরের নামও সে শোনে নি। কখনো কোথাও শুনে থাকলেও তার মনে ঐ নাম কোনো রেখাপাত করে না।

কোনো কথা না বলে সুজাতা অপেক্ষা করে রইলো। হলোই বা একটা বিদঘুটে, গেঁয়ো গান লালন ফকির নামে কোনো একজনের লেখা বা সুর দেওয়া, কিন্তু তাই নিয়ে মাঝ রাতে ঘুম ছেড়ে আলোচনা করতে হবে ? এটা তো ঠিক স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি তো কখনো এরকম করেন না।

—আমি বাজি ফেলে বলতে পারি এটা লালন ফকিরের গান।

—তুমি কার সঙ্গে বাজি ধরতে চাইছো ?

এতক্ষণে পুরোপুরি ঘোর কাটলো। সত্যিই তো, তিনি প্রায় পাগলের মতন ব্যবহার করেছেন।

উঃ হোঃ ! তোমায় ডিস্টার্ব করলুম। কত রাত হলো, তুমি এখোনো ঘুমোও নি ?

—আমি আর তিন চার পাতা শেষ করবো।

আর আধ ঘন্টা পরে একই ঘরের দুটি খাটে দু'জন নারী পুরুষ দু'রকম দু'টি স্বপ্ন দেখলো। একজন প্যারিসের মমাত অঞ্চলের, যেখানে ইন্সপেক্টর মেইগ্রে এই মাত্র এক কোটিপতি বাউণ্ডুলেকে স্ত্রী

হত্যার দায়ে গ্রেফতার করলেন। আর একজন দেখলো বাংলার এক অতি সাধারণ পাড়াগাঁরি। সেখানে দুতিনটি শিশু লাকোচুরি খেলছে এক আম-বাগানে।

পরদিন সকালে ঠিক সেই ছটাতেই ঘুম ভাঙলো জ্ঞানব্রতর। রুটিন মেলানো প্রত্যেকটি কাজ করে যেতে লাগলো। তবু মনের মধ্যে একটা অস্থির অস্থির ভাব। খেতে বসবার আগে সাতটি টেলিফোন এবং তিনজন দর্শন প্রার্থীর সঙ্গে কাজের কথা বলতে হলো তাঁকে তবু সেই ছটপটানিটা গেল না।

খাবার টেবিলে সুজাতা ঘুম ভেঙে উঠেই ছুটে এলো যথারীতি। উজ্জয়িনীও আজ এই সময় ব্রেক ফাষ্ট খেতে টেবিলে এসে বসেছে। মেয়েকে আজ একটু বেশী করে লক্ষ্য করতে লাগলেন জ্ঞানব্রত।

এই উজ্জয়িনীরই সহপাঠিনী এলা। উজ্জয়িনী বলেছে রবিবারে ব্যাণ্ডেলে পিকনিক করতে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে। সত্যি ব্যাণ্ডেলে যাবে, না কোনো হোটেলে গিয়ে মদ খাবে, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে ওর কি এর মধ্যেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে? না, না, সব মেয়ে এক রকম হতে পারে না।

—তুই এলা নামে কারুকে চিনিস?

মা আর মেয়ে দু'জনেই অবাক হলো। সুজাতার মুখে অবশ্য তার কোনো রেশ নেই, কিন্তু উজ্জয়িনী তো এখনো ঠিক লেডী হয়-নি, তাই সে বেশ চমকে গেল। তার বাবার মুখ থেকে এই ধরনের প্রশ্ন সে এই প্রথম শুনলো।

—এলা? কোন এলা?

—সরকার না চ্যাটার্জী কী যেন বললো পদবীটা ঠিক মনে নেই। তোর সঙ্গে ব্রেবোর্ণে কোনো এক বছরে পড়েছে।

—এলা কে? না তো। ঐ নামে তো কাউকে মনে করতে পারছি না। ভালো নাম কী?

—এটাই নিশ্চয়ই ভালো নাম, আমাকে শুধু ডাক নাম বলবে কেন? বললো যে একবার নাকি আমাদের এ বাড়িতেও এসেছে?

তুমি তাকে কোথায় দেখলে?

—ক্যালকাটা ক্লাবে—আমার একজন চেনা লোকের কাজিন হয় বললো। আমাকে আগে দেখেছে, তার খুব চেনা।

আমাকে—ও, এলা। হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি, মোটে এক বছর পড়েছিল, তারপর তো অনেকদিন আর দেখি নি।

—তোরা ব্যাণ্ডেল যাচ্ছিস এই রোববার?

—হ্যাঁ। বাবা, তোমার গাড়িটা দেবে সেদিন?

—ক'জন যাবি? ইচ্ছে করলে কারখানার একটা ষ্টেশন ওয়াগন নিতে পারিস।

—আমরা ছ'জন। অ্যামবাসেডরেই হয়ে যাবে।

—ড্রাইভার চাই? না, তোর বন্ধুদেরই কেউ চালাবে?

সুজাতা বললো, না, না, ওরা বড্ড জোরে চালায়——জ্ঞান সিং থাকুক ওদের সঙ্গে—

উজ্জয়িনী একবার তাকালো মায়ের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, মা! তুমি কেমন আস্তে গাড়ি চালাও?

একথা ঠিক সুজাতার হাতে ষ্টিয়ারিং পড়লে আর রক্ষা নেই। ইউরোপের ট্রাফিক আর কলকাতার ট্রাফিক যে এক নয়, সে কথা তার মনে থাকে না। দু'বার ছোটো খাটো অ্যাকসিডেণ্ট করেছে, তবু সুজাতা কম স্পীডে গাড়ি চালাতে পারে না।

সুজাতা বললো, আমি তো ঐজন্যই এখন গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছি।

জ্ঞানব্রত বেশ তৃপ্তির খাওয়া শেষ করলেন। নিজের মেয়ে সম্পর্কে তিনি মিথ্যে সন্দেহ করছিলেন। চুমকির মুখটা কত সরল, মোটেই ও এলার মত নয়। বাড়ির গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে নির্দোষ পিকনিকে।

কারখানা থেকে অফিসে আসবার পর তিনি রেডিও ষ্টেশনে ফোন করলেন। মিঃ বড়ুয়া, আমি জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী। আজ আবার আপনাকে একটু ডিসটার্ব করছি।

—মিঃ চ্যাটার্জী? বলুন লাষ্ট ইভনিং ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল। খুব জমেছিল—ঐ মেয়েটি আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল আমার কাছে।

—কোন মেয়েটি !

—ঐ যে এলা সরকার রেডিওতে চান্স চায়—আপনার রেফারেন্স এসেছে যখন, একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী মাঝপথে বাধা দিতে গেলেও বড়ুয়া সাহেব থামলেন না।

—জানেনই তো মিঃ চ্যাটার্জী আমাদের এখানে কিছুকিছু ফর্মালিটি তো আছেই, আমি নিজে গানটান খুব একটা বুঝি না, ওকে—তবে হয়ে যাবে, ওর ঠিক হয়ে যাবে, দেখলেই বোঝা যায় ট্যালেন্টেড, আপনি নিশ্চিত থাকুন, এজন্য আর ফোন করবার দরকার ছিল না।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী বলতে চাইলেন যে তিনি এলা নামের ঐ মেয়েটিকে মোটেই পাঠান নি। এবং তার জন্য ফোনও করছেন না। মেয়েটা দারুন কেরিয়ারিষ্ট তো! কালকের আলাপের সুযোগ নিয়ে আজ সকালেই বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করেছে।

কিন্তু এসব কথা তিনি টেলিফোনে বললেন না। এলা মেয়েটিকে তিনি পাঠান নি ঠিকই। তবে ঐ মেয়েটি এইভাবে রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পায় তাতে তিনি বাধাই বা দেবেন কেন? যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ও যা পারে করুক।

—মিঃ বড়ুয়া, আমি ফোন করছি আরও একটা কারণে—কাল সন্ধ্যেবেলা এই কথাটা-আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভেবেই—শেষ পর্যন্ত আর বলাই হলো না—হয়তো আপনি মনে করবেন খুবই পিকিউলিয়ার রিকোয়েষ্ট।

—কী ব্যাপার? আপনি এত হেজিটেট করছেন কেন?

—এটা আমার ব্যক্তিগত বলতে পারেন। কাল সকাল দশটা আন্দাজ, না ঠিক দশটাই হবে। একজন একটা পল্লীগীতি গাইছিল। সেই গায়কের নামটা আমি জানতে চাই। বেতার জগতে নাম ছাপা নেই, আমি এক কপি বেতার জগত কিনে দেখলুম আজ।

—কোন চ্যানেলে!

—মানে!

—শর্ট ওয়েভ? বিবিধ ভারতী?

—তা জানি না। ইন ফ্যাক্ট রেডিও বাজছিল পাশের বাড়িতে—গানের লাইনগুলো ছিল এই রকম ঃ

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগল পারা—

গানটি শুনে বড়ুয়া সাহেবও যে রীতিমতন অবাক হয়েছেন, তা টেলিফোনের এ পাশ থেকেও বোঝা যায়। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন কী গান? বোম্বাই? বোম্বাই শহরে। দাঁড়ান, দাঁড়ান, লিখে নিই।

তারপর তিনি বললেন, এই গানের গায়কের নাম আপনি জানতে চান?

—হ্যাঁ। সম্ভব হলে তার বাড়ির ঠিকানাও।

...নো প্রবলেম। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনাকে রিং ব্যাক করে জানিয়ে দিচ্ছি।

এ দেশের যাদের নামের সঙ্গে সাহেব যুক্ত থাকে, তারা অন্তত একটা ব্যাপারে সাহেবদের মতন নন। তাঁদের পনেরো মিনিট মানে দেড় ঘন্টা। দেড় ঘণ্টা বাদে বড়ুয়া সাহেব ফোন করে জানালেন যে ঐ গানের গায়ক একজন আনকোরা নতুন শিল্পী, তার নাম শশীকান্ত দাস। ঠিকানাটা এই—।

ঠিকানাটা কাগজে লিখতে লিখতে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলেন, এই জায়গাটা কোথায়?

বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তা কী করে জানবো বলুন, উনি তো কখনো আমাকে ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নি। কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি। এই লোকটিকে নিয়ে কী করবেন?

—ওর কাছ থেকে গানটা শিখবো। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বড়ুয়াকে আর কোনো কথা না বলতে দিয়ে জ্ঞানব্রত ফোন রেখে দিলেন।

আজ সারা পৃথিবীতে তাঁর যত কাজই থাক, তবু একবার এই শশীকান্ত দাসের সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে।

রেডিও ষ্টেশনের পি, সি বড়ুয়া যে ঠিকানাটি দিয়েছিলেন, সেই

বাড়িটি খুঁজে বার করতে খুব বেশী অসুবিধে হল না। বাগবাজারের কাছে একটা গলির মধ্যে মেসবাড়ি। এটা যে মেসবাড়ি তা দরজা দিয়ে ভিতরে এক পা বাড়ালেই টের পাওয়া যায়। এইসব বাড়িতেই একটা উগ্র পুরুষ পুরুষ গন্ধ থাকে।

অনেক কালের বাড়ি, সিঁড়িগুলো ক্ষয়ে যাওয়া, রেলিং নড়বড়। দোতলায় বারান্দায় একটা তারে নানান রঙের লুঙ্গি শুকোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত এসেছেন সন্ধ্যেবেলা, কিন্তু এখনো এ বাড়ির বাসিন্দার সবাই ফিরে আসেনি। চুপচাপ, খালি খালি ভাব. সদর দরজাটা হাট করে খোলা, একতলাতে একজনও লোক নেই। জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

মাঝপথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। লোকটির গায়ের রং –মিশমিশে কালো, রোগা লম্বাটে চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। লোকটি পরে আছে শুধু একটা গামছা।

তাকে এই মেসের কোনো ভৃত্য কিংবা রান্নার ঠাকুর মনে করে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলো, ওহে, শশীকান্ত দাস কোন ঘরে থাকেন, বলতে পারো?

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গভীর বিস্ময়ে তাকালো জ্ঞানব্রতর দিকে।

তারপর আমতা আমতা করে বললো; আজ্ঞে—আমিই শশীকান্ত—।

জ্ঞানব্রত একটু হাসলেন। তিনি এমন কিছু অন্যায় করেন নি। এই ঘটনার আরও অনেক ক্লাসিক উদাহরণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে খালি গায়ে দেখে একজন আগন্তুক জিজ্ঞেস করেছিল, ওহে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি আছেন কিনা বলতে পারেন? বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল সম্পর্কেও এ রকম গল্প আছে। তবু বঙ্কিমবাবু ছিলেন সুপুরুষ। বিদ্যাসাগর বা মাইকেলের তুলনায় এই লোকটিকে বেশ সুদর্শনই বলতে হবে। গায়ের রং কালো হলেও ছিপছিপে মেদবর্জিত শরীর। ভাল করে মেকাপ দিয়ে, মাথায় একটা পালকের মুকুট পরিয়ে দিলে অনায়া সেই যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুর সাজানো যায়।

জ্ঞানব্রত বললেন, ও, আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

লোকটির বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি। জ্ঞানব্রতর চেহারায়, ব্যক্তিত্বে ও পোশাকে বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ব্যাপার আছে। এই রকম

মানুষ সচরাচর শশীকান্ত দাসের মতন লোকের কাছে যেচে দেখা করতে আসে না।

শশীকান্ত বললো, আজ্ঞে আগে তো আলাপ হয়নি, চিনবেন কী করে?

আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

দরকারের কথা শুনে শশীকান্ত আরও বিভ্রান্ত। তার বুকের মধ্যে একই সঙ্গে দারুন বিপদের ভয় কিংবা দারুন কোনো সুসংবাদের আনন্দের জোয়ার-ভাঁটা চলছে।

—আমার সঙ্গে স্যার আপনার দরকার – বলুন স্যার।

জ্ঞানব্রতর হাব ভাব খুব বেশী সাহেবী ধরনের। বছরে দু'তিনবার তাঁকে ইউরোপ-আমেরিকা যেতে হয়। তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে রাখেন, কখনো একটু কাশতে হলে মুখের সামনে হাত চাপা দেন। প্রকাশ্যে কোনোদিন তিনি হাই তোলেন নি কিংবা হেঁচে ফেলেন নি। খাওয়ার পর ঢেকুর তোলা তার কাছে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

সেই রকমই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাজের কথা বলাও তাঁর পক্ষে একটা চরম অভদ্রতার ব্যাপার।

—আপনার ঘর কোনটা?

– ঐ যে স্যার, সিঁড়ির ডানপাশেই সাত নম্বর।

—আপনি আমায় মিনিট দশেক সময় দিলে আপনার ঘরে বসে একটু কথা বলতুম।

—নিশ্চয়ই স্যার, চলুন স্যার।

শশীকান্তর সঙ্গে সিঁড়ির দু'তিন ধাপ ওঠার পর জ্ঞানব্রত আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি স্নান করতে যাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ স্যার! সকালে জল পাওয়া যায় না, সবাই অফিস যায়, দশটার মধ্যেই চৌবাচ্চা খালি—তাই আমি বিকেলেই—

—ঠিক আছে। আপনি স্নান করে আসুন, আমার তাড়া নেই। আমি আপনার ঘরে অপেক্ষা করছি।

—না, না, স্যার, আমি পরে চান করবো। একদিন চান না করলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু জ্ঞানব্রতর পক্ষে গামছা-পরা খালি গায়ে একজন লোকের দিকে

সামনাসামনি তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। তাঁর রুচিতে বাঁধে।

এবার তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, না, এখনি আগে স্নান সেরে আসুন!

শশীকান্ত তবু ওপরে উঠে এসে সাত নম্বর ঘরের তালা খুলে, দরজাটা হাট করে বললে, আপনি ভেতরে বসুন তবে, স্যার, আমি দু'মিনিটের মধ্যে চান করে আসছি।

লোকটি বুদ্ধি করে এবার একটি লুঙ্গি ও জামা সঙ্গে নিয়ে গেল।

শশীকান্তর ব্যবহারে এর মধ্যেই জ্ঞানব্রত একটু দুঃখিত হয়েছে। ও একজন গায়ক, একজন শিল্পী, ও কেন একজন অচেনা লোকের সঙ্গে এমন স্যার বলে কথা বলবে? সব শিল্পীরই আত্মাভিমান থাকা উচিত।

ঘরখানা স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার। এরকম ঘরে জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী বহুদিন ঢোকেন নি। অস্বাস্থ্যকর ঘরেও মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকে তাই না? তারাও হাসে, স্ফূর্তি করে এবং ভবিষ্যৎ কালে মানুষদের জন্ম দেয়!

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি খাট, তার মধ্যে দুটি খাটের বিছানা গোটানো। অন্য বিছানাটি পাতাই রয়েছে। তার চাদরটা তেল চটচটে। সম্ভবত ঐ বিছানাটা শশীকান্তর। দেয়াল দুটি ক্যালেন্ডার ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। অন্ধকারটা একটু চক্ষু সইতে জ্ঞানব্রত দেখতে পেলেন, দুদিকের দেয়ালে দুটি আলনাও রয়েছে, তাতে জামা-কাপড় ডাঁই করা।

একটি বিছানা গুছোনো খাটে জ্ঞানব্রত বসলেন অতি সন্তর্পণে। সারা ঘর জুড়ে রয়েছে বিশ্রী গন্ধ, অনেকটা পচা চামড়ার গন্ধের মতন। এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে জ্ঞানব্রত পায়ের ডগাটি নাড়তে লাগলেন!

সিগারেটের তৃষ্ণাটা এই সময় তীব্র হয়ে ফিরে এলো। একা কোথাও বসে কারুর জন্য অপেক্ষা করায় সিগারেটের অভাবটা বেশী অনুভব করা যায়।

দু'মিনিট না হোক, প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো শশী-কান্ত। হুড়ুস-ধাড়ুস করে গায়ে জল ঢেলেই সে ছুটে এসেছে। ভিজে

চুল ঝুলছে মুখের চার পাশে।

—আপনি চা খাবেন, স্যার ?

জ্ঞানব্রত প্রথমে বললেন, না, তার পর একটু থেমে বললেন, আপনি আগে চুল আঁচড়ে নিন।

জ্ঞানব্রত ঠিক হুকুম করতে না চাইলেও তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তাঁর গলায় সেইরকম একটা সুর ফুটে ওঠে। প্রত্যেক দিন অনেকগুলি মানুষ তাঁর আদেশ মেনে কাজ করে। সেই জন্যই জ্ঞানব্রতর এইভাবে কথা বলা অভ্যেস হয়ে গেছে।

শশীকান্ত একটা খাটের তলায় উঁকি দিয়ে টেনে আনলো একটা কাঠের আয়না চিরুনী। তা দিয়ে ঝটাপট চুল আঁচড়ে ফেললো।

শশীকান্ত একটা সবুজ লুঙ্গির ওপর পরেছে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। এ রকম রঙের অসামঞ্জস্যে জ্ঞানব্রতর চক্ষুকে পীড়া দেয়। তবু তিনি মুখে পাতলা হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন।

—আপনি রেডিওতে গান করেন ?

—হ্যাঁ স্যার। আপনি কি রেকর্ড কোম্পানি থেকে এসেছেন ?

—না। আমার সঙ্গে ওসবের কোন সম্পর্ক নেই। একদিন রেডিওতে আপনার একটা গান শুনে—ইয়ে আমার...।

জ্ঞানব্রত ঠিক শব্দটি খুঁজে পেলেন না। বস্তুত দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। বাংলা কথার মধ্যেও মিশে যায় ইংরেজি–পরপর দু'তিনটে টানা বাংলা বাক্য বলার অভ্যেস তাঁর নেই।

—তিনি সংক্ষেপে বললেন, ভালো লেগেছিল।

—কোন গানটা স্যার !

—শহরে ষোলজন বোম্বেটে—করিয়ে পাগলপারা—।

—ও, ওখানা বড় ভালো গান স্যার ! সকলেরই ভালো লাগে।

—লালন ফকিরের, তাই না ?

—ঠিক ধরেছেন, স্যার। তবে লালন ফকিরের গানে কপি রাইট নাই। রেডিও'র লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল--

জ্ঞানব্রত একটা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বার করে খুললেন। সোটর

মধ্যে রয়েছে একটি নতুন হাতঘড়ি।

বাক্সটি শশীকান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে জ্ঞানব্রত অত্যন্ত বিনীত-ভাবে বললেন, আপনার গান শুনে আমার ভালো লেগেছিল সেইজন্য সামান্য একটি উপহার এনেছি। আপনি নিলে আমি খুব খুশী হবো।

শশীকান্ত নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন! রেডিওতে একখানা গান শুনে কেউ এসব দামি জিনিস উপহার দিতে পারে? রেডিওতে তো সবাই বিনা পয়সায় গান শোনে। পুরো একদিনের প্রোগ্রামের জন্য রেডিও থেকে সে পায় পঞ্চাশ টাকা মাত্র। আর এই ভদ্রলোক একখানা গান শুনে দিচ্ছেন একটা ঘড়ি। এর দাম পাঁচশো না হাজার কে জানে!

—এটা সত্যিই আমায় দিচ্ছেন স্যার?

আপনার জন্যই এটা এনেছি।

বস্তুত এটাও জ্ঞানব্রতর সাহেবী ব্যবহারেরই একটা অঙ্গ। এদেশের লোক অন্য লোকের সময়ের দাম দিতে জানে না। যখন তখন অন্যের বাড়ীতে বিনা অ্যাপয়েণ্টমেণ্টে গিয়ে তাদের সময় নষ্ট কারুর বাধে না। কিন্তু নিজের গরজে কারুর কাজে গেলে তার বিনিময়ে কিছু দেওয়া উচিত। জ্ঞানব্রত তো নিজের গরজেই এসেছেন।

শশীকান্ত মুগ্ধভাবে ঘড়িটি দেখছে। সেদিক থেকে তার চোখ ফেরাতে পারছে না। বোঝাই যায় সে কখনো নিজস্ব হাতঘড়ি হাতে পরার সুযোগ পায় নি।

—আমার একটা উপকার করবেন?

চমকে উঠে শশীকান্ত বললো, কী বলুন, স্যার?

—সেদিন রেডিওতে আপনার ঐ গানটা আমার পুরোপুরি শোনা হয় নি। যতটা শুনেছিলাম তাও মনে নেই। ঐ গানটি আমাকে আরএক-বার গেয়ে শোনাবেন?

—এখন শুনাবেন, স্যার, এখানে মিউজিক টিউজিক কিছু নেই, রেডিও ষ্টেশানে ওদের সব ব্যবস্থা থাকে। আচ্ছা। আমি খালি গলাতেই শোনাতে পারি অবশ্য—

হঠাৎ জ্ঞানব্রতর মনে হলো, মেসের এই গুমোট-অন্ধকার ঘরে বসে

ঐ গানটা শুনলে তাঁর ভালো লাগবে না। বরং আরো ভালো লাগাটা কেটে যাবে।

তিনি হাত তুলে বললেন, থাক। এখন থাক। এক কাজ করলে হয় বরং— একদিন আমার বাড়ীতে গিয়ে ঐ গানটা গাইবেন। তাহলে টেপে তুলে রাখতে পারি। যাবেন আমার বাড়িতে?

শশীকান্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গিয়ে বললো, নিশ্চয়ই যাবো, স্যার। কোথায় আপনার বাড়ি? কবে যাবো?

কোটের পকেট থেকে জ্ঞানব্রত নিজের একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, এতে সব লেখা আছে।

যদি শশীকান্ত ইংরেজি না পড়তে পারে, সেইজন্য তিনি মুখেও নির্দেশ দিয়ে দিলেন তার বাড়ির অবস্থান সম্পর্কে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কাল থেকে এই রবিবারের মধ্যে যে কোনো দিন সন্ধেবেলা আসতে পারেন। সাতটার পর থেকে আমি বাড়িতে থাকবো।

—কালই যাবো, স্যার?

—আপনি এ গান কার কাছ থেকে শিখেছেন?

—কুষ্টিয়ায় যখন ছিলাম, তখন বাবনু সাঁইয়ের কাছ থেকে শিখে-ছিলাম। বাবনু সাঁই অনেক গান শিখিয়েছেন আমায়। তিনি খোদ লালন ফকিরের শিষ্যের শিষ্য!

—কুষ্টিয়া!

—হ্যাঁ স্যার। সেখানেই আমার বাড়ি।

—এখানে এসেছেন কবে?

—এসেছি তো স্যার দুই বৎসর আগে—তারপর স্রোতের শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছি। কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। এখানে এই ঘরে পরেশ রায় থাকেন। তিনি আমাদের গ্রামের লোক, তিনি দয়া করে কিছুদিনের জন্য আমায় থাকতে দিয়েছেন। তা অন্য যে একজন আছেন তিনি পছন্দ করেন না আমায়। তিনি একঘরে তিনজন থাকা নিয়ে ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করেছেন।

—আপনার বাড়ির অন্য লোকজন কোথায়?

—আমার মা বাবা কেউ নেই, স্যার। আর দুচার মাস পরে আমি নিজেই একখানা ঘর ভাড়া করতে পারবো মনে হয়। রেডিও আর্টিষ্ট

হবার পর দু'চার জায়গায় ফাংশানে চান্স পাই, স্যার। পঁচাত্তর টাকা করে দেয়।

—কুষ্টিয়ার কোন গ্রামে ছিল আপনার বাড়ি?

—কুমারখালী। আপনি কুমারখালী গ্রামের নাম শুনেছেন, স্যার? কুমারখালীতে থানাও আছে—।

যেন একটা বিদ্যুৎ চমকালো জ্ঞানব্রতর মাথার মধ্যে। তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর দাদামশাইয়ের মুখখানা। লম্বা চেহারা, সারা মুখে দাড়ি। সম্রাট শাহজাহানের মতন পেছনে দুটি হাত দিয়ে পায়চারি করতেন লম্বা টানা বারান্দায় আর মুখে প্রায় সব সময়ই থাকতো গুন-গুন গান। গান বাজনার দারুন ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই দাদামশাইয়ের মুখেই জ্ঞানব্রত এই গানটা শুনেছেন অতি শৈশবে। ক'দিন ধরে সেই কথাটাই মনে করতে পারছিলেন না।

হ্যাঁ, একথাও মনে পড়ছে যে দাদা মশাইয়ের কাছে প্রায়ই একজন ফকির এসে গান শোনাতেন। দু'জনে বন্ধুত্ব ছিল। সেই ফকিরই, কি বাবন সাঁই।

জ্ঞানব্রত অনেকটা আপন মনেই বললেন কী আশ্চর্য যোগাযোগ? ঐ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে,

—আপনার বাড়ি কুমারখালীতে, স্যার? কোন বাড়ি?

—আমাদের নিজেদের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি, সেখানেই আমি বেশী থেকেছি। আমার দাদামশাই ছিলেন সত্যপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি, খুব নামকরা বাড়ি—।

জ্ঞানব্রত সেখানে ছিলেন মাত্র ন'বছর বয়েস পর্যন্ত। সেই সময় দাদামশাই মারা যান। তারপর এগারো বছর বয়েসে পিতৃবিয়োগ। তারপর থেকে অনেকগুলি দুঃখ কষ্টের বছরের কথা স্পষ্ট মনে আছে জ্ঞানব্রতর, কিন্তু তার আগের কথা কিছুই মনে পড়ে না। অথচ সেই সময়টা ছিল কত সুখের।

অনেকের তো দু'তিন বছর বয়েসের কথাও কিছু কিছু মনে থাকে। অথচ জ্ঞানব্রতর শৈশবটা নিশ্চিহ্ন। শুধু একটা গান, সেই সময় শোনা একটা গান এতদিন পরে ফিরে এলো।

জ্ঞানব্রত সেই ধরনের মানুষ নন যে তিনি এক সময় কুষ্টিয়ার

ছিলেন বলেই আর একজন কুষ্টিয়ার লোককে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরবেন আনন্দে। ওরকম দেশোয়ালি প্রীতি তাঁর নেই। বস্তুত পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তীব্র কোনো নস্টালজিয়াও তিনি বোধ করেন না। মানুষ বাঁচে বর্তমান দিয়ে, হঠাৎ জ্ঞানব্রত শশীকান্তকে বললেন, আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

শশীকান্ত আবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

—আপনার বাক্স-বিছানা নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে। আপনার থাকবার জায়গার অসুবিধে বলছিলেন, আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন।

—আপনার বাড়িতে থাকবো, স্যার ?

- হ্যাঁ।

—আজই ?

—তাতে অসুবিধে কি আছে ?

—পরেশদাকে কিছু বলে যাবো না ?

—ওকে চিঠি দিয়ে যান। পরে আর একদিন এসে সব বুঝিয়ে বলবেন। আমার বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে। আপনার অসুবিধে হবে না।

—না, না আমার আর কী অসুবিধে, আমি যেখানে সেখানে থাকতে পারি—কিন্তু সত্যি বলব স্যার ? কেমন কেমন সব লাগছে। মনে হচ্ছে যেন রূপকথা। আপনি এসে আমায় একটা ঘড়ি দিলেন তারপর বললেন, আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন এও কি সম্ভব !

জ্ঞানব্রত এবার বেশ জোরে জোরে হাসলেন !

তারপর বললেন, আপনাদের এই গলির মোড়ে আমার গাড়ি আছে। আমি সেখানে অপেক্ষা করছি ! আপনি তৈরি হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।

শশীকান্তকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত।

নিজের বাড়িতে এসে শশীকান্তকে নিয়ে সরাসরি উঠে এলেন দোতলায়।

এখানে একটি গেস্ট রুম সারা বছর সাজানোই থাকে। অতি নিকট আত্মীয় কেউ এলেই তবে তাঁকে রাখা হয় এই দোতলার ঘরে। এ ছাড়া একতলায় আরও দুটি ঘর আছে।

শশীকান্তকে ঘর এবং সংলগ্ন বাথরুম দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন জ্ঞানব্রত, এই সময় সুজাতা এসে সেখানে দাঁড়ালো। যতই অবাক হোক মুখে তার কোনো চিহ্ন ফোটাবে না সুজাতা, তবু মনে মনে সে ভাবছে, হঠাৎ কী হলো মানুষটার? গত কয়েকদিন ধরে যে-রকম ব্যবহার করছে, তা কিছুতেই তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। এই রকম একটা মিস্ত্রী টাইপের লোককে ধরে এনে দোতলার ঘরে রাখতে চায়।

জ্ঞানব্রত স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন; সুজাতা, ইনি একজন শিল্পী, এর নাম শশীকান্ত দাস, আজ থেকে ইনি আমাদের এখানে থাকবেন। দেখো, যেন এর কোনো অযত্ন না হয়।

শশীকান্ত এগিয়ে এসে সুজাতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সুজাতা 'আরে' 'আরে' বলে দু'তিন পা পিছিয়ে গেল।

জ্ঞানব্রত বললেন. উজ্জয়িনী কোথায়? ওর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিতে চাই।

পরদিনই জ্ঞানব্রত চলে গেলেন মাদ্রাজে।

বাড়িতে যে কী একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে গেলেন, তা জ্ঞানব্রত খেয়ালও করলেন না। কয়েকটা দিন তিনি একটু পাগলামিতে মেতে ছিলেন ; কিন্তু কোম্পানীর নানান কাজে তাঁকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাকছে।

মাদ্রাজ থেকে দিল্লী, সেখান থেকে উলটে আবার বাঙ্গালোর, তার-পর বোম্বাই। অর্থাৎ সাতদিনে প্রায় পাঁচ হাজার মাইলে ওড়াউড়ি করতে হলো জ্ঞানব্রতকে।

এদিকে বাড়িতে এক অদ্ভুত অতিথি।

প্রথম গোলমাল শুরু হলো সকাল আটটায়।

সুজাতা কোনদিনই ন'টার আগে জাগে না। এখন স্বামী কলকাতায় নেই, এখন তো আরও বেলা পর্যন্ত ঘুমানো যায়। কাল রাতে সুজাতা স্লিপিং পিল খেয়ে শুয়েছে। তবু আটটার সময়েই তার ঘরের দরজায় দুম দুম দুম ধাক্কা।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঘুম-জড়িত চোখে দরজা খুলে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার!

সুজাতার শিক্ষা-দীক্ষা এমনই যে, সে কোনো কারনে বিরক্ত হলেও প্রথমেই ঝি-চাকরের ওপর ধমকে ওঠে না, কিংবা বাড়িতে ডাকাত পড়া অথবা আগুন লাগার মতন বিচলিত হয়ে ওঠে না যখন তখন।

সারদা এ বাড়ির বাসনপত্র মাজে, ঘর ঝাড় দেয়। সে প্রায় চোখ কপালে তুলে বললো, ও দিদিমণি! ও ঘরের বিছানায় কে একটা ডাকাতের মতন লোক ঘুমিয়ে আছে? কী সাংঘাতিক কথা! শিগগির পুলিশে খবর দাও?

মাথায় ঘুমের নেশা, সুজাতার আগের কথা স্পষ্ট মনে পড়লো না। সারদা আঙ্গুল তুলে গেষ্ট রুমটা দেখাল। সেখানে একজন লোক ঘুমিয়ে আছে! কে!

—বাবু কোথায়?

—বাবু তো ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তখন সুজাতার মনে পড়লো, জ্ঞানব্রতর আজ সকাল ছ'টা দশের ফ্লাইট ধরার কথা। নিশ্চয়ই পাঁচটার মধ্যে গেছে। এসব দিনে জ্ঞানব্রত কখনো স্ত্রীকে ডাকেন না।

কিন্তু গেষ্ট রুমে কে শুয়ে থাকবে?

—রতন কোথায়?

—রতন দুধ আনতে গেছে, এখনো আসে নি।

এ বাড়ির কাজের লোকরা রাত্তিরে সবাই নিচে থাকে। সিঁড়ির মাঝখানে একটা লোহার গেট থাকে। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় রাত্রে। রোজ ভোরে জ্ঞানব্রত সেই গেট খুলে দেন। তিনি কলকাতার বাইরে থাকলে এই সারদা এসে রাত্রে শুয়ে থাকে দোতলার বারান্দায়।

পাতলা নাইটি পরে থাকে সুজাতা। ঘরের মধ্যে ফিরে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার বাইরে বেরুলেন। তারপর গেষ্ট রুমের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন। এবার সব মনে পড়ে গেছে। সেই রাধাকান্ত না শশীকান্ত কী যেন, সেই লোকটি নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রত যাকে কাল রাত্রে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

সুজাতা হেসে জিজ্ঞেস করলো, কালো মতন একটা লম্বা লোক তো?

সারদা বললো, হাঁ গো দিদিমণি। দেখতে ভয় করে।

—ভয়ের কিছু নেই। বাবুর চেনা লোক। জেগে উঠলে চা দিস।

সুজাতা আবার ফিরে গেল নিজের বিছানায়।

যাদের জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে না, তারা প্রায়ই কোনো রোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কে ভাবতে ভালোবাসে।

সারদা ধরেই নিয়েছিল যে, কোনো হুমদো চেহারার চোর এ বাড়িতে ঢুকে পড়ে, তারপর মনের ভুলে ঘুমিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করে ওকে আটকে সবাই মিলে চেঁচিয়ে, পুলিশ ডেকে বেশ একখানা জমাট ব্যাপার হবে। সে সব কিছুই হলো না। এ রকম উটকো চেহারার লোক বাবুর চেনা। বাবুদের বিছানায় শোবে? সারদার স্বামীও তো এর চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল, সে কোনদিন বাবুদের গদীতে শোওয়ার কথা কল্পনাও করে নি।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সারদা এবার নির্ভয়ে অতিথি ঘরে ঢুকল। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, মুখে মেচেতার দাগ, তবু সারদাকে দেখলে কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের গিন্নী হিসেবে অনেকের মনে হতে পারে। বেশ পরিষ্কার একটি সাদা শাড়ী পরা। এ বাড়ির দাস-দাসীরা ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকবে, এই সুজাতার নির্দেশ। ওদের জামা-কাপড় কিনে দিতে সুজাতার কোনো কার্পণ্য নেই।

শশীকান্ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে। খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে তার একটা পা। তার শোয়ার ভঙ্গিতেও গ্রাম্যতা আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারে নি। ঘুমোনো সহজ না কি? তার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে সে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। নরম বিছানায় শুয়ে শুয়েও উত্তেজনায় তার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কী হয়ে গেল ব্যাপারটা! এসব স্বপ্ন নয় তো? মাঝে মাঝে উঠে উঠে সে হাত ঘড়িটা দেখছিল। এই ঘড়িটাও সত্যি, তার নিজস্ব ঘড়ি। ঠিক যেন সোনা দিয়ে তৈরি।

শেষ রাতে সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারদা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী জোরে ঘর ঝাঁট দিতে লাগলো। তাতেও লোকটার ঘুম ভাঙলো না দেখে সে জিনিসপত্র

সরাতে লাগলো খটাখট শব্দে। এক সময় শশীকান্ত চোখ মেলে তাকা-তেই সারদা ঘুরিয়ে নিল নিজের মুখটা। একটাও কথা বললো না সে লোকটার সঙ্গে। শুধু, সে যে লোকটিকে পছন্দ করে নি, এটাই বুঝিয়ে দিতে চায়।

শশীকান্তও সারদার সঙ্গে কথা বলার সাহস পেল না।

সুজাতার ভাঙ্গা ঘুম আর জোড়া লাগে নি। আরও কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করার পর ডাকলেন, রতন! রতন!

রতন ততক্ষণে দুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। চায়ের জলও চাপানো আছে। রতন! সুজাতা ডাকা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা নিয়ে আসতে হয়। খুব পাতলা চা দু'তিন কাপ খায় সুজাতা।

রতন চায়ের ট্রে এনে সাজিয়ে দিল সুজাতার বেড-সাই টেবিলে।

—ঐ যিনি গেষ্ট রুমে আছেন, তাঁকে চা দিয়েছিস্?

—না!

—উনি জেগেছেন?

—হ্যাঁ।

—তা হলে চা দিস নি কেন?

ও চা খায় কিনা তাতো আমি জানিনা।

সুজাতা হাসলো। রতনের মুখখানা ঘোঁজ হয়ে আছে। রতনের মনের ভাব বুঝতে সুজাতার একটুও অসুবিধে হয় না।

রতনের চেহারা ও পোশাক ঐ লোকটির থেকে অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। ঐ রকম একটি লোককে ডেকে এনে বাবুদের বিছানায় শোওয়ানো হবে, এটা সে-পছন্দ করবে কেন? এ রকম লোককে সেবা করতেও সে অরাজী।

—ওকে জিজ্ঞেস কর। উনি যদি চা না খান, তা হলে এক কাপ দুধ দে। উনি খুব ভালো গান করেন।

—আজ দুপুরেও এখানে খাবে?

—খাবেন তো নিশ্চয়ই? উনি এখানে বেশ কয়েকদিন থাকবেন। তোদের বাবু তাই তো বলে গেছেন।

এবার সুজাতা স্নানের ঘরে ঢুকবে। এরপর অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য সারা পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

শশীকান্ত ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছে উবু হয়ে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘর থেকে বেরুতে সে ভয় পাচ্ছে। জ্ঞানব্রত বাবু তাকে এ ঘরে থাকতে বলেছেন। এ ঘরের বাইরে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করা কি উচিত তার পক্ষে ?

রতন কিছু জিজ্ঞেস না করেই এক কাপ চা রেখে গেছে তার সামনে। গরম গরম চা-টা শেষ করে ফেললো শশীকান্ত। এর আগে একবার সে বাথরুমটা দেখে এসেছে। বাথরুমে কমোড। শশীকান্ত জানে না ও জিনিস কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। ওঃ কি ঝামেলার মধ্যে তাকে ফেললেন ঐ জ্ঞানব্রত বাবু।

এর পরের বিপত্তিটা হলো অন্য রকম।

উজ্জয়িনী কাল নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। ফিরেছে প্রায় বারোটায়। সুতরাং সে শশীকান্তকে দেখে নি।

দশটা আন্দাজ ঘুম থেকে উঠেই উজ্জয়িনী গেল বাথরুমে। টুথব্রাশ হাতে নিয়ে দেখলো, টুথ পেষ্ট নেই।

টুথ পেষ্ট কোম্পানীর মালিকের বাড়ীতেও কখনো টুথ পেষ্ট না থাকা বিচিত্র কিছু নয়। যে জিনিস ইচ্ছে করলেই বিনে পায়সায় শত শত পাওয়া যায়, সেই জিনিসের কথা মনেই থাকে না।

এমনও হয়েছে, সকালবেলা বাথ-রুমে টুথ পেষ্ট না পেয়ে রতনকে পাঠিয়ে দোকান থেকে টুথ পেষ্টের নতুন টিউব কিনে আনতে হয়েছে। রতন অতশত বোঝে না। সে এনেছে অন্য কোম্পানীর টুথ পেষ্ট। তখন সেটা ফেরত পাঠানো হলো। কিন্তু পাড়ার দোকানে গোল্ডেন ষ্টার টুথ পেষ্ট নেই। ফলে বাধ্য হয়েই অন্য টুথ পেষ্ট ব্যবহার করতে হতো।

জ্ঞানব্রত দৈবাৎ নিজের বাড়ীতে সেই অন্য কোম্পানীর টুথ পেষ্টের টিউব দেখে ফেলেছিলেন। তিনি ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেন নি।

বাথরুমের বন্ধ দরজার আড়াল থেকে দু'বার চেঁচিয়ে ডাকল, মা, মা।

কিন্তু সুজাতা নিজেই এখন বাথরুমে বন্দী। সে এখন মেয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না।

উজ্জয়িনীর স্বভাব অত্যন্ত ছটফটে। কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা

করার ধৈর্য তার নেই। সব জিনিস তার এক্ষুণি, এক্ষুণি চাই।

তার মনে পড়লো। গেষ্ট রুমের সঙ্গের বাথরুমে এক সেট জিনিস সব সময় রাখা থাকে। ওখান থেকে টুথ পেষ্ট ধার করা যায়।

হাতে ব্রাশটা নিয়ে রাত-পোশাক পরা অবস্থানেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনী ছুটে গেল গেষ্ট রুমে।

মায়ের কাছ থেকে এইটুকু অন্তত শিক্ষা পেয়েছে উজ্জয়িনী যে সে হঠাৎ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে না, সহজে ভয়ও পায় না।

বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ লুঙ্গি পরা, খালি গায়ের একজন কালো, লম্বা লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আড়ষ্টভাবে থমকে গেল উজ্জয়িনী।

বাঘকে বশ করবার জন্য যেমন তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকতে হয়, সেই রকমভাবে চেয়ে উজ্জয়িনী জিজ্ঞেস করলো, তুমি—তুমি কে?

তার চেয়েও বেশী আড়ষ্টভাবে শশীকান্ত বললো, আজ্ঞে, আমার নাম শশীকান্ত দাস—

—তুমি এখানে কি করছ?

—আজ্ঞে, জ্ঞানব্রতবাবু আমাকে এখানে থাকতে বলেছেন।

—এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি নিজে কাল রাতে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন· আমি নিজে থেকে আসতে চাই নি, তিনিই জোর করে বললেন।

উজ্জয়িনী শশীকান্তর আপাদমস্তক আর একবার দেখলো। কিছুতেই এর কথা বিশ্বাস করা যায় না। তার বাবা এই রকম একটা লোককে...রতন রতন বলে ডাকতে ডাকতে উজ্জয়িনী বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। তারপর রতনের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

সারাদিন ধরে শশীকান্তর সঙ্গে কথা বলার জন্য কেউ এলোনা।

উজ্জয়িনী চলে গেল কলেজে। একটু পরে সুজাতাও চলে গেল মহিলা সমিতির এর মিটিং এ। সুজাতার খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক নেই। এক একদিন দুপুরে কিছু খাওয়াই হয় না। শরীর থেকে

অন্ততঃ দশ পাউণ্ড ওজন খসিয়ে ফেলতে সে বদ্ধপরিকর।

রতন দুপুরের খাবার দিয়ে গেল শশীকান্তর ঘরেই।

চীনে মাটির প্লেটে ভাত, তারই মধ্যে ডাল, আলু ভাজা। আর একটি বাটিতে মাংস।

ঐ টুকুনি ভাত, শশীকান্ত তিন গেরাসে খেয়ে নিতে পারে। বস্তুতঃ ভাত ছাড়া তার আর কোনো প্রিয় খাদ্য নেই। শুধু একটু ডাল পেলেই সে পুরো এক সের চালের ভাত খেয়ে ফেলতে পারে।

সেই ভাতটুকু শেষ করে শশীকান্ত থালা চাটতে লাগলো। রতনের আর পাত্তা নেই।

মেস বাড়ির ঠাকুরও জিজ্ঞেস করে আর ভাত লাগবে? আর এ বাড়ির কেউ তা জিজ্ঞেস করলো না? এ কী রকম বাড়ি? গতকাল রাতে জ্ঞানব্রত নিজের সঙ্গেই শশীকান্তকে নিয়ে বসে ছিলেন খাবার টেবিলে। রাতে ছিল রুটি। শশীকান্ত রুটি পছন্দ করে না। তাছাড়া প্রথম দিন সে লজ্জায় বেশী খায় নি। কিন্তু প্রত্যেক দিন এরকম সিকি-পেটা খেয়ে থাকতে হলেই হয়েছে আর কি! তা হলে কাজ নেই তার নরম গদীর বিছানায়।

সারাদিন শশীকান্ত চুপচাপ শুয়ে রইলো সেই ঘরে।

রাতে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে ফেললো সে।

রতন খাবার নিয়ে আসতেই সে বলে উঠলো, আমি রুটি খাই না। ভাত নেই?

রতন বললো, এ বাড়িতে রাত্রিতে ভাত হয় না।

শশীকান্ত তাতেও দমে না গিয়ে বললো, বেশ! কিন্তু ও কয়খানি রুটিতে আমার পেট ভরবে না। আরও রুটি লাগবে।

খাবারের প্লেট নামিয়ে রেখে রতন ফিরে গেল। ফিরে এলো আরও প্রায় দশ বারোখানা রুটি নিয়ে।

ব্যাঙের সুরে সে জিজ্ঞেস করলো, এতে হবে?

শশীকান্ত ঘাড় নাড়লো।

তারপর মুখ তুলে, খাতির করা গলায় জিজ্ঞেস করলো—দাদার নাম কী?

খুবই অবজ্ঞার সুরে সে বললো, রতনকুমার দাস।

উৎসাহিত হয়ে শশীকান্ত বললো, আপনিও দাস। আমিও দাস। আমার নাম শশীকান্ত দাস। কুষ্টিয়ায় বাড়ি।

এতেও বরফ গললো না। আর কোনো উত্তর না দিয়ে রতন চলে গেল। যেন সে বুঝিয়ে দিতে চায়, তার দাস আর শশীকান্তর দাস এক নয়। বাংলাদেশের লোক। তাই ধরণ ধারণ এরকম।

প্রায় এই রকম ভাবেই সাতটা দিন কাটলো।

নির্জনতায় অতিষ্ঠ হয়ে সপ্তম রাত্রিতে মরীয়া হয়ে গিয়ে শশীকান্ত ধরলো গান। বেশ উঁচু গলায়। সেই গানটা, শহরে ষোলোজন বোম্বেটে—

তখন উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে ইংরেজি বাজনা।

অষ্টম দিন দুপুরের দমদম এয়ারপোর্টে এসে পেঁছুলেন জ্ঞানব্রত।

আগে থেকে খবর দেওয়া আছে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ ছাড়া মালপত্রের ঝঞ্ঝাট নেই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত বেরিয়ে আসছেন বাইরে, হঠাৎ একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ে কোথা থেকে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালো।

এক গাল হেসে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আমায় চিনতে পারছেন?

মুখে একটানা ভ্রমণের ক্লান্তি, হাতে একটা ভারি ব্রীফকেস, জ্ঞানব্রত চাইছিলেন কোনোক্রমে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে গলার টাই ও জামার বোতাম খুলে ফেলতে।

সামনে মেয়েটিকে দেখে তাকে থমকে দাঁড়াতেই হলো।

মেয়েটি সারা মুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে বললো, নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছেন? আমি কে বলুন তো?

এই কয়েকটা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষজনের মধ্যে থাকতে হয়েছে। জ্ঞানব্রত বাংলাতে কথা বলারও কোনো সুযোগ পান নি। হঠাৎ কলকাতায় পা দেবার পর মুহূর্তেই কেউ এরকম পরীক্ষায় ফেললে তিনি পারবেন কেন?

মেয়েটিকে চেনা লাগছে ঠিকই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। মেয়েটি বেশ রূপসী, সঙ্গে কেউ নেই, এয়ারপোর্টে একা, তবে কি কোনো এয়ার হোস্টেস? কিন্তু এয়ার হোস্টেসদের পোশাকের মধ্যে কী রকম যেন নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার

থাকে, সেটা দেখলে বোঝা যায়। এর পোশাক সে রকম নয়। বেশ একটা চড়া রঙের লাল শাড়ী পরে আছে।

মেয়েটি জ্ঞানব্রতর চোখে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করছে বলে তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনতে পারবো না কেন ?

—আমার নাম বলুন তো ?

নামটা তো মনে নেই বটেই, এমনকি, কোথায় সে দেখেছেন মেয়েটিকে, তাও মনে করতে পারছেন না জ্ঞানব্রত।

—এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ? এই তো মাত্র দশ বারো দিন আগে দেখা হয়েছিল।

—কোথায় ?

—ক্যালকাটা ক্লাবে। আপনার এক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন, কতক্ষণ আপনার টেবিলে বসলাম।

—এলা ?

—যাক, চিনতে পেরেছেন তাহলে।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, কেন মেয়েটিকে তিনি ঠিক প্লেস করতে পারছিলেন না। এ রকম একটি সুশ্রী মেয়েকে মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখে তাঁর ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেদিন মেয়েটি জিন খেয়ে নেশা করেছিল বলে তার চোখ দুটি ছিল কাঁচের মতন। আর প্রায় সর্বক্ষণই দেখেছিলেন বসে থাকা অবস্থায়। আজ একে দেখছেন একেবারে ভিন্ন পরিবেশে ! বিভিন্ন রকম চুল বাঁধবার কায়দাতেও মেয়েদের মুখ অনেকখানি বদলে যায়।

—জানেন, আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক ?

বিমান যাত্রীদের কাছে এ সংবাদ বেশ একটা বড় সমস্যা বটে, কিন্তু জ্ঞানব্রতর মনে কোনো দাগ কাটলো না। কলকাতা শহরে তাঁর ট্যাক্সি চড়ার কোনো অবকাশ হয় না। তাঁর জন্য নিশ্চয়ই গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে।

—তুমি কোথাও যাচ্ছো, না আসছো ?

এলা আবার হেসে ফেললো। তারপর ছেলেমানুষদের মতন দুষ্টুমীর সুরে বললো, আমি কোথাও যাচ্ছিও না, আসছিও না।

জ্ঞানব্রত ব্রীফকেসটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলেন।

—আমি একজনকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।

—ও।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো হলো। চলুন একটু কফি খাবেন? সেদিন আপনি আমাকে অনেক খাইয়ে দিলেন আজ আমি আপনাকে খাওয়াবো।

একটু ইতস্ততঃ করে জ্ঞানব্রত বললেন, ঠিক কফি খাবার ইচ্ছে এখন আমার নেই, বাড়ি ফেরার একটু তাড়া আছে, ওটা না হয় আর একদিন হবে।

—আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই? আমি কিন্তু লিফ্‌ট নেবো।

—খুব ভালো কথা।

—আসবার সময় কী কাণ্ড! আমার এক দিদি আজ আগরতলায় গেল। সঙ্গে অনেক মালপত্র, এদিকে ট্যাক্সি বন্ধ··শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে একটা শেয়ারের গাড়িতে—

টার্মিনালের বাইরে এসে জ্ঞানব্রত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এক জায়গায়। গাড়ি তাঁকে খুঁজতে হবে না। গাড়ির ড্রাইভারই তাঁকে খুঁজে বার করবে।

—কোথায় আপনার গাড়ি? কত নম্বর?

—ব্যস্ত হবার কিছু নেই, গাড়ী আসবে এখানে।

—জানেন, আপনি আমার একটা দারুণ উপকার করেছেন?

জ্ঞানব্রত রীতিমতন অবাক হয়ে বললেন, আমি! আমি আপনার কী উপকার করেছি? মাত্র একদিন দেখা।

—চলুন, গাড়িতে যেতে যেতে বলছি।

ঠিক এই সময় একজন কেউ ডাকলেন, জ্ঞানদা। জ্ঞানদা।

জ্ঞানব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখলেন বাবুল আমেদ হন্তদন্ত হয়ে আসছে এই দিকে। দুহাতে দুটি সুটকেস।

বাবুল আমেদ মোটাসোটা, হাসি খুশী মানুষ। কার্ড বোর্ড বক্সের বেশ বড় ব্যবসা আছে। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। জ্ঞানব্রতর চেয়ে দু'তিন বছর বড়ই হবেন, কিন্তু ইনি প্রায় সবাইকেই দাদা বলে ডাকেন।

—আরে দাদা, কী ঝামেলায় পড়েছি। আমার ফেরার কথা ছিল

গতকাল। সে ফ্লাইট মিস করেছি, তারপর আর খবরও দিতে পারিনি, সেই জন্য আমার গাড়ি আসেনি! এদিকে আবার ট্যাকসি স্ট্রাইক। আপনার কী অবস্থা?

জ্ঞানব্রত বললেন, চলুন, আপনাকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

এলার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া পড়লো। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সে পছন্দ করছে না।

জ্ঞানব্রতর কোম্পানির গাড়ি তখনই চলে এলো সামনে। ড্রাইভার নেমে সেলাম করতেই জ্ঞানব্রত বললেন, পেছনের বুট খুলে দাও, এই সাহেবের সুটকেস যাবে।

এলা বললো, আমি সামনে বসি।

বাবুল আমেদ বললেন, না, না, আপনি সামনে বসবেন কেন? আমি বসবো। আমার সামনে বসাই অভ্যেস।

গাড়ি চলতে শুরু করার পরই বাবুল আমেদ ব্যবসাপত্রের কথা শুরু করে দিলেন। দাদা, আপনি স্টেট ট্রেডিং-এর মালহোত্রাকে চেনেন? এবার দিল্লীতে গিয়ে দেখলাম।—

জ্ঞানব্রত হুঁ হুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ কথা থামিয়ে বাবুল আমেদ বললে, রোককে। ড্রাইভার সাহেব, এখানে একটু রুখে দিন তো।

—কী হলো?

—এই সামনের দোকান থেকে একটু কোল্ড ড্রিংকস নেবো। অনেকক্ষণ ধরে তেষ্টা পেয়েছে। হঠাৎ কী রকম গরমটা পড়ে গেল দেখলেন?

গাড়ী থামতে পাশের দোকানে চার বোতল কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার দিলেন বাবুল আমেদ, অর্থাৎ ড্রাইভারের জন ও একটা। পেছনের সীটে দুটি বোতল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি জ্ঞানব্রতকে বললেন, দাদা এ আপনার মেয়ে তো? এতক্ষণ চিনতেই পারিনি, সেই অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলাম, ফ্রক পরার বয়েস তখন—

একরম ভুল করার জন্য বাবুল আমেদকে দোষ দেওয়া যায় না

এলা তো জ্ঞানব্রতর মেয়েরই প্রায় সমবয়েসী। তাছাড়া অনাত্মীয়

যুবতী মেয়েকে নিয়ে গাড়ীতে ঘোরার সুনাম জ্ঞানব্রতর নেই ব্যবসায়ী মহলে।

এলা মুখটা ফিরিয়ে থাকে।

জ্ঞানব্রত একটু বিব্রতভাবে বললেন, না, না, আমার মেয়ে না মেয়ের বান্ধবী, এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা হলো।

জ্ঞানব্রতকে সামান্য মিথ্যে কথা বলতে হলো। এলা তাঁর মেয়ের সঙ্গে এক বছর এক কলেজে পড়েছে বটে, কিন্তু তার মেয়েটি বান্ধবী নয়। উজ্জয়িনী এলার নাম শুনে ভালো করে চিনতেই পারে নি। বয়েসের তুলনায় এলা অনেক বড় হয়ে গেছে।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করার পর বাবুল আমেদ আবার ফিরে গেলেন ব্যবসার কথাবার্তায়। এলা কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না।

বাবুল আমেদ নামলেন মৌলালীতে।

তারপর এলা গম্ভীরভাবে বললো, আমাকে এসপ্লানেডে ছেড়ে দিলেই হবে।

—তোমার বাড়ি কোথায় ?

—অনেক দূরে, বেহালার কাছে।

বেহালা অনেক দূরে তো বটেই তাছাড়া একেবারে অন্য রাস্তায়। জ্ঞানব্রত অতিশয় ভদ্র, মাঝপথে কোনো মহিলাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী পেঁছে পোশাক বদলাবার জন্য তাঁর মনটা ছটফট করছে!

এখন রাত সাড়ে ন'টা। একবার তিনি ভাবলেন, তিনি আগে বাড়ী গিয়ে তারপর ড্রাইভারকে বলবেন, বেহালায় এই মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে ? তাঁর বাড়ীর সামনে গাড়িতে এলা বসে থাকবে—।

জ্ঞানব্রতকে দ্বিধা করতে দেখে এলা বললো, আমাকে এই সামনে এসপ্লানেডে নামিয়ে দেবেন, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে তো আমি মিনি বাসেই ফিরতাম।

জ্ঞানব্রত জোর দিয়ে বললেন, না সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি তোমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আসবো। কতক্ষণ আর লাগবে।

—আমার বাড়ী পর্যন্ত গেলে আপনাকে একবার নামতে হবে। কথা দিন।

—এখন, এত রাত্রে?

—ক'টা আর বাজে?

—অন্ততঃ দশটা বেজে যাবে।

তাতে আর কী হয়েছে। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন শুধু।

—আমি সন্ধ্যের পর চা কফি কিছু খাই না!

এবার গলা নীচু করে, মুচকি হেসে এলা বললো, হুইস্কি অবশ্য খাওয়াতে পারবো না বাড়িতে।

জ্ঞানব্রত নিয়মিত মদ্যপান করেন না। কখনো কখনো একটু একটু। মেয়েটি কি তাঁকে নেশাখোর ভেবেছে নাকি? পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে যাবার পর ক'জন লোকেই বা রাত দশটার সময় চা খায়?

এসপ্লানেড আসবার পর জ্ঞানব্রত ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন বেহালার দিকে যাওয়ার জন্য। তারপর তিনি অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গেলেন?

—আপনি আমার ওপর রেগে গেলেন?

—আরে? রাগ করবো কেন?

—কোনো কথা বলছেন না আমার সঙ্গে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এ মেয়েটা কি পাগল নাকি? হঠাৎ তিনি রাগ করতে যাবেন কেন ওর ওপরে? তা ছাড়া কোনো কিছু বলবার না থাকলেও কথা বলে যেতে হবে? এমনিতেই কম কথা বলা তাঁর স্বভাব।

—আপনার কৌতূহল খুব কম, তাই না?

—কেন? সেটা কী করে বোঝা গেল।

—আপনি আমায় এয়ারপোর্টে দেখেও প্রথমে জিজ্ঞেস করেন নি কার সঙ্গে সেখানে গেছি। তারপর এই যে আপনাকে বললাম, একবার আমার বাড়িতে নামতে হবে, তখনও জিজ্ঞেস করলেন না, বাড়িতে কে কে আছে।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, এবার মেয়েটি ঠিকই ধরেছে। এটা

বোধ হয় সুজাতার প্রভাব। সুজাতা কখনো কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে না। নারী জাতির মধ্যে সুজাতার মতন এমন কম কৌতূহলপরায়ণা খুবই দুর্লভ।

তিনি হেসে বললেন, একটা ব্যাপারে অবশ্য আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে, তুমি তখন বললে, আমি তোমার উপকার করেছি সেটা কী উপকার?

—আপনি রেডিও'র স্টেশন ডিরেকটার পি, সি, বাড়ুয়ার সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলেন, মনে আছে?

—হুঁ।

—উনি আমায় গানের প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন। আগে আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পাইনি। এবার যে পেলাম সে তো আপনার জন্যই।

—এ জন্য আমি তো কোনো চেষ্টা করি নি। যাই হোক। যদি তোমার উপকার হয়ে থাকে আর তাতে আমার কোনো যোগাযোগ থাকে তাতে আমার খুশী হবারই কথা।

—সামনের মাসেই আমার প্রোগ্রাম।

—বাঃ!

—আপনারা বেশ মেকানিক্যাল। যখন তখন বাঃ বলতে পারেন। এলার গলায় রাগের ঝাঁঝের পরিচয় পেয়ে জ্ঞানব্রত একটু সচকিত হলেন। তিনি কোনো ভুল করে ফেলেছেন?

—এখানে, বাঃ! বলা বে-মানান?

—নিশ্চয়ই বে-মানান। আমি কেন গান করি, সে সম্পর্কে আপনার একটু কৌতূহল নেই, তবুও বললেন বাঃ।

রেডিওতে প্রত্যেকদিন কত ছেলে মেয়েই তো গান গায়। তা ছাড়া জ্ঞানব্রত অতি কদাচিত রেডিও শোনেন! সুতরাং রেডিওতে কে কবে কী গান গাইবে, সে ব্যাপারে জ্ঞানব্রতয় কৌতূহল বা আগ্রহ থাকবে কেন? কিন্তু যে জীবনে প্রথম রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছে তার কাছে এটা নিশ্চয়ই খুবই উত্তেজনার ব্যাপার।

—না। না। শুনতে হবে। একদিন শুনবো তোমার গান।

—দেখি, সে দিনটা কবে আসে।

—খুব শিগগিরই একদিন—

—একটা মুশকিল হয়েছে কী জানেন, আমি নজরুল–অতুল প্রসাদ গাই. কিন্তু বড়ুয়া সাহেব বললেন, পল্লীগীতিতে স্কোপ বেশী। ঐ প্রোগ্রামে ভালো আর্টিস্ট পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমার একটা করে পল্লীগীতির অনুষ্ঠানও করে যেতে হবে। আমি ফোক সং কোনোদিন তেমন শিখিনি–এখন শিখতে যেতে হবে কারুর কাছে।

এতক্ষণে শশীকান্তর কথা মনে পড়লো জ্ঞানব্রতর। তিনি একজন গায়ককে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। সে ছেলেটা কী করছে কে জানে? সে কি সুজাতা-উজ্জয়িনীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে?

–আমি একজন পল্লীগীতির গায়ককে চিনি! ভালো গায়। জানি না, সে তোমায় শেখাতে পারবে কিনা।

–কে? কে? কি নাম?

–একদিন আলাপ করিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে।

এলা তার ডান হাতটা সীটের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে জ্ঞানব্রতর একটা হাতের ওপর রাখলো। জ্ঞানব্রত প্রায় শিহরিত হলেন। এ কী করছে মেয়েটা? সামনে ড্রাইভার রয়েছে। এরকমভাবে তো প্রেমিক-প্রেমিকারা হাতের ওপর হাত রাখে। মেয়েটা তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে কেন?

জ্ঞানব্রত নিজের হাতটা সরিয়ে নিতেও পারলেন না। জানলা দিয়ে বাইরের দিক চেয়ে আড়ষ্টভাবে বসে রইলেন।

বেহালার বাড়ির সামনে পেঁছে এলা আর বিশেষ জোর করলো না। জ্ঞানব্রত দু'বার না বলতেই সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে। আজ নামতে হবে না। কিন্তু বাড়ি তো চিনে গেলেন, অন্য কোন দিন আসবেন তো?

হ্যাঁ, আসবো! গান শোনা আর চা পাওনা রইলো।

অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে জ্ঞানব্রতর দিকে হেসে এলা খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি জানি, আপনি ঠিক আসবেন।

বাড়ি ফেরার পর সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, এত দেরি হলো? প্লেন লেট ছিল?

–না। আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক। দু'জনকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে

এলুম। ভালো করে স্নান করে পা-জামা ও পাঞ্জাবী পরার পর জ্ঞানব্রত খুব স্বস্তির সঙ্গে বললেন, আঃ।

আজ তাঁর ভালো ঘুম হবে। নিজের বালিশটিতে মাথা দিয়ে ঘুমোনোর মতন আরাম আর নেই।

খাওয়ার টেবিলের কাছে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িটা বড্ড চুপচাপ লাগছে। খুকু কোথায়?

—ও নাইট শো-তে সিনেমায় গেচে। বুলু মাসীদের সঙ্গে। আর একটু বাদেই ফিরবে।

—তুমি গেলে না সিনেমায়?

—আমি কি সব সিনেমা দেখি? তাছাড়া তুমি আজ আসবে।

সেই ছেলেটি কোথায়? সে খেয়েছে?

সুজাতা এ প্রশ্নে কোনো উত্তর না দিয়ে টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে মুখখানা নিচু করে রইল।

উত্তর না পেয়ে বিস্মিত হলেন জ্ঞানব্রত। চেয়ারে না বসে তিনি এগিয়ে গেলেন গেষ্ট রুমের দিকে।

সে ঘরটির দরজাটা বন্ধ। জ্ঞানব্রত একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঘর ফাঁকা।

এ কি? সেই ছেলেটি গেল কোথায়? শশীকান্ত? সুজাতা খুব ধীর স্বরে বলল, সে আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। সারা দিনে আর ফেরে নি।

স্ত্রীকে দু' একটি প্রশ্ন করেই থেমে গেলেস জ্ঞানব্রত।

বাড়িতে তিনি একজন অতিথি রেখে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েক দিন কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখলেন সেই অতিথি নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় অতিথির প্রতি অযত্ন অবহেলা, অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখান হয়েছিল নিশ্চয়!

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ এমনকি উঁচু গলায় কথা বলাও জ্ঞানব্রতর স্বভাব নয়। তাঁর সব কিছুই মনে মনে।

শশীকান্ত কোথায় যেতে পারে? তার তো কোনো যাবার জায়গা নেই। যে মেস ছেড়ে চলে এসেছে, সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠে না, কারণ সেখানে একজন রুমমেট তাকে তাড়িয়ে দেবার

জন্য ব্যস্ত ছিল। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে? যোধপুর পার্কে বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত, অনেকেই বলে। পুলিশে ফোন করা কি উচিত হবে? শশীকান্ত একজন শক্ত সমর্থ চেহারার পুরুষ মানুষ, সে বাড়ি ফেরেনি বলে থানায় খবর দিলে যদি সেখানকার লোকেরা হাসাহাসি করে?

পোশাক বদলে জ্ঞানব্রত দুটি ঘুমের ট্যাবেলট খেয়ে শুয়ে পড়লেন। সুজাতা বাথরুমে, উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ড'প্লেয়ারে একটা উগ্র বিদেশী সুর বাজছে। জ্ঞানব্রত একদিন দেখেছিলেন, উজ্জয়িনী ঘরের মধ্যে একা একাই নাচে। তখন বড় সুন্দর দেখায় ওকে, চোখ দুটো মোহের আবেশে বুজে আসা হাতের আঙ্গুলগুলো যেন গড়া। ঠোঁটের ভঙ্গিতে অদ্ভুত সরলতা। কিছুদিন ধরে মেয়ের কথা ভাবলেই এলার কথা মনে পড়ে। ওরা প্রায় একই বয়েসী। কিন্তু দুজনে কত আলাদা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাত পোশাক পরা সুজাতা নিজের খাটে শুয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কিন্তু আজ আর ডিটেকটিভ উপন্যাস খুললো না।

—তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো?

জ্ঞানব্রত চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। চক্ষু বোজা। বুকের উপর আড়াআড়ি দুটি হাত রাখা। আজ আর ঘুমের আরাধনা করতে হবে না ট্যাবলেট তার কাজ ঠিক সময় মতন করবেই। এর সঙ্গেই হাত-পা একটু ঝিমঝিম করছে।

—না। তুমি কিছু বলবে?

—আমাদের যে এক সঙ্গে বাইরে কোথাও যাবার কথা বলেছিলে? যাবে না?

—হ্যাঁ। যাওয়া যেতে পারে। কোথায় যাবে, ঠিক করেছ?

—পুরী।

—পুরী গত বছরই তো গিয়েছিলুম।

—গতবার তো সারাক্ষণই বৃষ্টি হলো সমুদ্র আমার ভালো লাগে··

—ঠিক আছে। কালই হোটেল বুক করবার ব্যবস্থা করবো।

নিজের খাট থেকে উঠে এসে সুজাতা বললো, একটু সরো তোমার পাশে আমি শোবো।

—আজ বই পড়বে না ?

—কেন, তোমার পাশে শুলে আপত্তি আছে ?

জ্ঞানব্রত হাত বাড়িয়ে সুজাতার কোমর ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। মনে মনে অনুশোচনা হলো। কেন ঘুমের ট্যাবলেট খেতে গেলেন আজ। আসল ব্যাপারটা হবার আগে সুজাতা অনেকক্ষন আদর পছন্দ করে। যদি তার মধ্যে ঘুম এসে যায় !

জ্ঞানব্রতর মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরে সুজাতা জিজ্ঞাসা করলো তুমি আমার উপর রাগ করেছো ?

—কেন, রাগ করবো কেন ?

—ঐ যে গায়কটি শশীকান্ত ও বাড়ি ফেরেনি, তুমি ভাবছ ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি—

—না না, সে কথা বলবো কেন ?

—লোকটি তো কথাই বলতে চায় না, এত লাজুক, আমি দু-এক বার চেষ্টা করেছি—তুমি শখ করে ওকে বাড়িতে ডেকে এনেছো, ওর যাতে কোনো অযত্ন না হয় সে কথা আমি কাজের লোকদের বলেছিলাম।

—না, না, তুমি তো যথেষ্ট করবেই, আমি জানি।

—তোমার শরীর বেশ ভাল নেই, কিছুদিন ধরেই দেখছি, তুমি অন্যমনস্ক ?

—শরীর তো ঠিকই আছে। অন্যমনস্ক থাকি বুঝি ?

—তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করছো আজকাল।

সুজাতার উরু কি মসৃন, তলপেটে ভাঁজ পড়েনি, বুক দুটি এখনো সুগোল। বোঝাই যায় না, তার অতবড় মেয়ে আছে। আজ জ্ঞানব্রতকে প্রমাণ করতে হবে. তিমি এখনো সক্ষম পুরুষ মানুষ। কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না।

মধ্যপথে বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। বেডরুমের টেলিফোনের কানেকশন রাত এগারোটার পর অফ করা থাকে। সুজাতা নিজেই এটা করে। আজ সে ভুলে গেছে! আজই। বেশী রাতের টেলিফোনের আওয়াজে কেমন একটা গা ছম ছম করা ভয় আছে। জ্ঞানব্রতর নির্দেশ আছে অফিসের হাজার জরুরী কাজ থাকলেও কেউ যেন তাঁকে রাত এগারোটার পর বিরক্ত না করে। কিন্তু যদি

ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে ?

স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই একটুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুনলো আওয়াজটা। তারপর সুজাতা বললো, আমি ধরবো ? জ্ঞানব্রত বললেন, না, আমি ধরছি।

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। জড়িত গলায় কে যেন হিন্দিতে কী জানতে চাইছে।

জ্ঞানব্রত কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো ? হু ইজ স্পিকিং ? হুম ডু য়ু ওয়ান্ট ?

রং নাম্বার !

জ্ঞানব্রতর ইচ্ছে হলো টেলিফোন যন্ত্রটা আছড়ে ভেঙে ফেলতে। তার বদলে তিনি তার ধরে এক টান দিয়ে প্লাগটা খুলে ফেললেন। সুজাতা ততক্ষণে উঠে বসেছে। জ্ঞানব্রত ফিরে আসতেই বললো, আজ আর থাক।

জ্ঞানব্রত আপত্তি করলেন না। তিনি জানেন, একটু কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটলেই সুজাতার মুড অফ হয়ে যায়।

এরপর শুতে—না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন জ্ঞানব্রত। যেন ট্যাবলেটের ঘুম তাঁর জন্য জানলার বাইরে অপেক্ষা করছিল।

পরদিন সকালবেলা জানা গেল শশীকান্ত বাড়ির গেটের বাইরের সিঁড়িতে বসে ঘুমোচ্ছে।

জ্ঞনব্রত নিজেই যথেষ্ট ভোরে ওঠেন কিন্তু তাঁর আগেই রঘু দেখতে পেয়েছে। খবর পেয়ে জ্ঞানব্রত সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই শশীকান্ত ধড়মড় করে জেগে উঠে চোখ কচলাতে লাগলো।

— কী ব্যাপার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন ?

—আমি হারায় নাই স্যার, আমারে যারা পেঁছাতে এসেছিল—

—তারা কারা ?

—ব্যান্ডেলে গেছিলাম স্যার, একটা ফাংশান ছিল। আসরে গাইতে দিল রাত এগারোটার পর। দুইখানা গানের পর পাবলিক বললো, আরও চাই—আরও চাই। গাইলাম আরও তিনখানা।

—বাঃ, ভালো কথা। ব্যান্ডেলে ফাংশান করতে গিয়েছিলে তো সে কথা এ বাড়িতে কাউকে বলে যাওনি কেন ?

—দুপুরে রেডিও স্টেশনে গেলাম। সেখানে বিমানদা, বললেন, ব্যাণ্ডেলে একটা ফাংশান আছে, যাবে? বোম্বাইয়ের একজন আর্টিষ্ট আসে নাই। ওরা সেইজন্য তিন চারজন একস্ট্রা লোকাল আর্টিষ্ট চেয়েছে। যাবে তো এক্ষুনি চলো, একশো টাকা পাবে। তা স্যার, একশো টাকা রেট তো আমারে আগে কেউ দেয় নাই, তাই রাজি হয়ে গেলাম। পাবলিক খুব সাপোর্ট দিছে স্যার, আমারে থামতেই দেয় না! ঐ গানটা গাইলাম, ষোলো জন বোম্বেটে—

—ঠিক আছে। বাড়ির ভেতরে এস, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

—আপনি রাগ করছেন, স্যার?

—না। আমাকে স্যার বলে ডেকো না।

—কী বলবো?

—ইয়ে, শুধু দাদা বলতে পারো।

এরপর শশীকান্তের জন্য অন্য ব্যবস্থা হলো। দোতলার সুসজ্জিত গেস্ট রুমটির বদলে তাকে পাঠানো হলো একতলার সাদা মাটা একটি ঘরে। সেখানে সে বেশী স্বস্তি পাবে। ঘরটা বাড়ির পেছন দিকে ইচ্ছে করলে সেখানে সে তার গানের রেওয়াজও করতে পারে। তাতে ওপর তলায় লোকেদের কোনো ব্যাঘাত হবে না। তার খাবারও পাঠিয়ে দেওয়া হবে নিচে।

এসব সুজাতারই ব্যবস্থাপনা।

খাবার টেবিলে বসে জ্ঞানব্রত বললেন, তাহলে শনিবারেই পুরীর হোটেল বুক করছি। শচীনকে বলে দিচ্ছি, আজই টিকিট কেটে ফেলবে। ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্লেনে যাবে, না ট্রেনে?

সুজাতা বললো, ট্রেনেই ভাল। এক রাত্রিরই তো ব্যাপার। ওখানে গাড়ি পাওয়া যাবে তো?

হঁ্যা, টুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্টের গাড়ি ভাড়া করলে হবে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় ঘুম-চোখে উস্কোখুস্কো চুলে এসে হাজির হলো উজ্জয়িনী! টেবিলে বসেই বললো, আমার দুধটা দিয়ে দাও আমি আজ তাড়াতাড়ি বেরুবো।

সুজাতা বললো, খুশী? এই শনিবার আমরা পুরী যাচ্ছি।

উজ্জয়িনী যেন আকাশ থেকে পড়লো। সারা মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে

বললো, পুরী ? এখন ? তোমাদের কি মাথা খারাপ ?

—কেন ?

—গত বছর মনে নেই ? সর্বক্ষণ বৃষ্টি।

—তা বলে কি এবারেও বৃষ্টি হবে ?

—নিশ্চয়ই হবে। দেখছো না, এখানে এরই মধ্যে দু'একদিন বৃষ্টি হয়ে গেলো !

—তা হোক না। বৃষ্টির মধ্যেও সমুদ্র দেখতে কত ভালো লাগে। ইচ্ছে হলে আমরা পুরীর বদলে কোনারকে গিয়েও থাকতে পারি।

—তোমাদের ভালো লাগে তোমরা যাও।

—তুমি যাবে না ?

—ইমপসিবল ? আমি কলকাতা ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারবো না।

—কেন তোর এমন কি কাজ কর্ম আছে, শুনি।

এই শনিবার দিন পারমিতার জন্মদিনের পার্টি। আমরা অনেক মজা করবো, কত দিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি।

—ঠিক আছে, আমরা তা হলে শনিবারের বদলে রবিবার যাবো।

—রোববার থেকে আমাদের নাটকের রিহার্সাল। আমরা মিড সামার লাইট্‌স ড্রিম করছি !

—তা হলে আমরা যাবো, তুই যাবি না ?

—তোমরা কি আমায় জিজ্ঞেস করে যাওয়া ঠিক করেছো ? আমার সুবিধে অসুবিধে কিছু আছে কিনা তা একবারও ভেবে দেখবে না ?

জ্ঞানব্রত চুপ করে আছেন। মেয়ে বড় হয়েছে, তার একটা নিছক মতামত তো থাকবেই। বাবা-মা যখন যেখানে যেতে বলবে, তাতে রাজি হবে কেন ?

উজ্জয়িনীর ওপর জোর করেও কোনো লাভ নেই। দারুন জেদী মেয়ে।

মা ও মেয়েতে আর কিছুক্ষণ উত্তর প্রত্যুত্তর চলবার পর জ্ঞানব্রত বাধা দিয়ে বললেন, থাক ও যদি যেতে না চায়, ও থাক।

—তা বলে বাড়িতে ও একা থাকবে ?

উজ্জয়িনী এবার ফোঁস করে উঠে বললেন, হোয়াট ডু য়্যু মীন একা? আমি একা থাকলে ভূতের ভয় পাবো?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'লো উজ্জয়িনী একাই থাকবে। পুরীতে যাবে শুধু স্বামী স্ত্রী। জ্ঞানব্রতর ক্ষীণ আশা ছিল, যদি সুজাতা পুরো ব্যাপারটাই ক্যানসেল করে দেয়। কেননা, পুরীতে এখন বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছে তাঁরও নেই। কিন্তু সুজাতা যাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

অফিসে গিয়েই হোটেলের বুকিং এবং টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেললেন জ্ঞানব্রত। তারপর কাজে ডুবে গেলেন।

নিজে কিছুদিন তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন, আবার বাইরে যাচ্ছেন, মাঝখানে অনেকগুলো কাজ সেরে রাখতে হবে।

দুদিন বাদে শেষ বিকেলে একটা টেলিফোন পেলেন জ্ঞানব্রত।

—আমি এলা বলছি। নাম শুনে চিনতে পারছেন তো?

—হ্যাঁ।

—আপনি আজ খুব ব্যস্ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ব্যস্তই বলা যায়।

—তা হলে আমি যাবো না। আমার ইচ্ছে ছিল আপনার কাছে গিয়ে নেমন্তন্ন করার। টেলিফোনেই বলবো?

মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞানব্রত চিন্তা করলেন, কিসের নেমন্তন্ন? বিয়ের এরই মধ্যে মেয়েটি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে! আশ্চর্য!

—হ্যাঁ বলুন, মানে,ইয়ে বলো—

—কাল সন্ধেবেলা আপনি ফ্রি আছেন তো? না থাকলেও আপনাকে সময় করতেই হবে।

—কী ব্যাপার?

—আমার এখানে একটা ছোট্ট ঘরোয়া গান-বাজনার আসর কালকে। আপনার আসা চাই। আমি কিন্তু কোনো রকম আপত্তি শুনবনা আসতে হবেই।

জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছে না। এই মেয়েটি যেন তাঁকে ক্রমশই জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। সামান্য একটা ছোট্ট ঘরে থাকে মেয়েটি সেখানে গান বাজনার আসর? এই মেয়েটির সব কিছুই যেন অদ্ভুত।

—আপনি কিছু বলছেন না যে, হ্যালো ! হ্যালো !

—আমার পক্ষে তো কাল যাওয়া সম্ভব নয়। একটা জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

—সন্ধে বেলাতেও কাজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হি হি হি ! কতক্ষণ লাগবে ? আপনি একটু দেরি করে আসুন, কোনো অসুবিধাই নেই।

—একটু নয়, অনেক দেরি হবে।

—কতক্ষণ, ন'টা দশটা ? তার পরেও অন্তত আসুন একটুক্ষণের জন্য।

দশটার পরেও একটি কুমারী মেয়ে তার বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করছে। জ্ঞানব্রত এসব জীবনে একেবারেই অভ্যস্ত নয়।

তিনি কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বললেন, না, আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। দুঃখিত।

আর কিছু শোনার আগেই তিনি রিসিভার রেখে দিলেন।

এই মেয়েটিকে আর একটুও প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। একে একেবারে মুছে ফেলতে হবে মন থেকে।

কাজ শেষ করার পর যথারীতি বাড়ী ফিরে তিনি একটু চাঞ্চল্য বোধ করলেন। আবার কি ব্লাড প্রেসার বেড়েছে ? তাঁর এক বন্ধু তাঁর চিকিৎসক। তার কাছে একবার যাবেন নাকি ?

সারাদিন প্যাচপেচে গরম গেছে। বাথরুমে ঢুকতে গিয়েও তিনি ঘেমে গেলেন। ইচ্ছে করছে সাঁতার কাটতে। ডাক্তারও বলেছিলেন অবগাহন স্নানে ব্লাড প্রেসারের উপকার হয়।

গাড়ি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়ে চলে এলেন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে। এক সময় এখানে তিনি নিয়মিতই আসতেন। হার্টের গণ্ডগোলটার পর আর আসা হয় না।

আজ ইচ্ছে করছে দু-এক বোতল বীয়ার পান করতে। এই গরমে ভালো লাগবে। কিংবা অনেক খানি বরফ দিয়ে গিমলেট। কিন্তু জ্ঞানব্রত সে ইচ্ছেটা দমন করলেন। তাঁর এক বন্ধু বোম্বাইতে তিন পেগ জিন খেয়ে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। সুইমিং পুলের মধ্যেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়, চিকিৎসারও সুযোগ পায়নি।

নীল রঙের পরিস্কার জল। তলার দিকটা বেশ ঠাণ্ডা। অন্য যারা

সাঁতার কাটছে তারা প্রায় সবাই সাহেব-মেম। ভারতীয়রা এই ক্লাবের সভ্য হয় বটে। কিন্তু প্রায় কেউ জলে নামে না, জলের ধারে টেবিল নিয়ে বসে মদ খায় আর আড়চোখে অর্ধলগ্ন মেমদের দেখে।

আপন মনে সাঁতার কাটতে কাটতে জ্ঞানব্রতর হঠাৎ ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সাঁতার শিখেছেন গ্রামের পুকুরে। কুষ্টিয়ার কুমার খালী গ্রামে। মামা বাড়িত তাঁর সেজো মামা ন'বছর বয়স্ক জ্ঞানব্রতকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন পুকুরের মধ্যে। আকু পাকু করতে করতে ডুবে যাবার ঠিক আগে সেজো মামা এসে ধরে ফেলতেন। এইভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সাঁতার শেখা হয়ে যায়।

এসব মনে পড়ে নি তো এতদিন! ক্যালকাটা ক্লাবের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে এসে এর আগে কোনোদিন তাঁর গ্রামের পুকুরের কথা মনে পড়েনি। শশীকান্তর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই। কিন্তু এর মধ্যে একদিনও তো শশীকান্তর সঙ্গে গল্প করা হলো না, কিংবা শোনা হলো না তার গান।

খাণিকক্ষণ সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে জ্ঞানব্রত ওপরে উঠে বসলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নামবেন। জল খুব ভালো লাগছে আজ।

হঠাৎ পুলের ডান পাশের দিকে চোখ চলে গেল তাঁর, একজন নারীর বাহু ধরে এগিয়ে আসছে একজন দীর্ঘ চেহারার পুরুষ। রেডিওর সেই পি সি বড়ুয়া আর এলা ওরা কোনো খালি টেবিল খুঁজছে।

জ্ঞানব্রত চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

সুইমিং পুলের রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উঠে এলেন জ্ঞানব্রত। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

এলা কিংবা বড়ুয়া তাকে দেখতে পায় নি। জলের ধারে একটা টেবিলে বসে কী একটা কথায় যেন ওরা দু'জনেই হাসছে।

জ্ঞানব্রত চলে গেলেন পোশাক বদলাবার ঘরে। আগে গা মাথা মুছলেন ভালো করে। তারপর দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। নিজের মুখটা এত অচেনা লাগছে কেন? কেন তিনি একটু একটু কাঁপছেন? তাঁর ঈর্ষা হয়েছে? এই জিনিষটা তো তাঁর কোনদিন ছিল না। এলাকে তো তিনি এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলেন।

পোশাক পরে নিয়ে বাইরে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তার এখন চলে যাওয়া উচিত। ওরা গল্প করছে করুক। এর মধ্যে তিনি নানান লোকের কাছে শুনেছেন যে ঐ বড়ুয়ার খুব মেয়ে-বাতিক আছে। কোনো সুন্দরী মেয়ে পেলে ছাড়ে না।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু একটা প্রবল চুম্বক যেন তাঁকে টানছে পেছন থেকে। খুব ইচ্ছে করছে আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখতে তবু তিনি শক্তভাবে হাঁটতে লাগলেন। তার পিঠে কার ছোঁয়া লাগতেই তিনি চমকে উঠে বললেন, কে?

—আপনি আমাদের দেখতে পেয়েও চলে যাচ্ছেন যে?

এলার মুখখানিতে কী চমৎকার সুস্বাস্থ্যের তাজা ভাব। কলঙ্কহীন মসৃণ, নিষ্পাপ মুখ। জ্ঞানব্রত যেন একটি বৃষ্টিভেজা সদ্য ফোটা ফুল দেখছেন। তিনি কোনো কথা বললেন না।

—আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এই মেয়েটি প্রায় তাঁর নিজের মেয়ের বয়সী। কিন্তু উজ্জয়িনার তুলনায় কত বেশী অভিজ্ঞ। মুখখানা যত নিষ্পাপ দেখায় মোটেই তত নিষ্পাপ নয়। যার তার সঙ্গে প্রকাশ্য জায়গায় মদ খেতে যায়। গায়িকা হিসেবে নাম কেনার জন্য পি, সি, বড়ুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পুরুষ মানুষদের দিকে এমনভাবে তাকায় যাতে সরলতার সঙ্গে মিশে থাকে লাস্য। ক্যালকাটা ক্লাবে প্রথম আলাপের দিন জ্ঞানব্রতর দিকেও এলা এইভাবে তাকিয়ে ছিল।

অথবা, এসব দোষের নয়। জ্ঞানব্রত পুরোনো পন্থী; ব্যবসার জগতে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে পৃথিবী কতটা বদলে গেছে, তা তিনি জানেন না?

অনেককিছু বদলালেও ভালোবাসা, লোভ, দুঃখ, ঈর্ষা এসব বদলায় না। জ্ঞানব্রতর বুকের মধ্যে যে একটা জ্বালা ভাব, সেটা ঈর্ষা ছাড়া আর কী।

তিনি ঠাণ্ডাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর?

এলা বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে একটু বসবেন না?

—আমি একটু সাঁতার কাটতে এসেছিলুম।

—একটু বসুন। এক্ষুণি চলে যাবেন।

—হ্যাঁ, যেতে হবে।

—আপনি আমায় দেখলেই এড়িয়ে যেতে চান কেন, বলুন তো?

—ইয়ে···তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাওয়ার কি কোনো কথা ছিল? সুতরাং এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে কি করে? চলি।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না, এবার বেশ গট গট করে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত। এলাকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরে তিনি বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন।

একটু আগে তাঁর মনে হচ্ছিল, এলা মেয়েটি তাকে ঠকিয়েছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে পি, সি, বড়ুয়ার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, সুইমিং ক্লাবে লাঞ্চ খেতে এসেছে। এবার তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এরকম কোনো মেয়ের সঙ্গে বাজে খরচ করার মতন সময় তাঁর নেই।

কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনের ভাব বদলে গেল আবার।

সুইমিং ক্লাবে প্রথমে বড়ুয়ার সঙ্গে এলাকে দেখে তাঁর ঈর্ষা হয়েছিল, এটা অস্বীকার করতে পারেন না। তারপর এলা তাঁকে ডাকতে এলেও তিনি ওদের সঙ্গে বসতে রাজি হন নি। এতে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। তা হলে এখন আবার কষ্ট হচ্ছে কেন? অফিসে কোনো কাজে মন বসছে না। একটু আগে একজন সাপ্লায়ার এসে কী বলে গেল তা তিনি ভাল করে শোনেনেই নি।

এলাকে তিনি অপমান করেছেন। এরকম তো তাঁর স্বভাব নয়। কারুর সঙ্গেই তিনি রূঢ় ব্যবহার করেন না। বিশেষত একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে এ রকম কেন হলো?

সন্ধ্যের পর তার ড্রাইভার ছুটি চাইলো। দেশ থেকে তার কোন আত্মীয় আসবে। তাকে আনতে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে। সাহেবকে বাড়ী পেঁছে দেবার পর বাকি সন্ধ্যেটা ছুটি চায়।

অফিস থেকে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিলেন জ্ঞানব্রত। অনেকদিন পর তিনি নিজে আজ গাড়ি চালাবেন। বুকে ব্যথা হবার পর থেকে ডাক্তারের উপদেশে তিনি গাড়ি চালানো বন্ধ করে ছিলেন।

এ কি, এ তিনি কোথায় যাচ্ছেন? নিজের ব্যবহারেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন জ্ঞানব্রত। মনের কোন গভীর জায়গায় এইসব ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে? এদিকে এলার বাড়ি। এলা একদিন খুব অনুরোধ করেছিল তার বাড়িতে কিছুক্ষণ বসবার জন্য।

প্রথম আলাপে এলা বলেছিল, সে ওয়াকিং গার্লস হোস্টেলে থাকে। তারপর সে আলাদা ফ্ল্যাটের কথা উল্লেখ করেছিল। এলা তো চাকরি করে না। এ সব খরচ সে চালায় কি করে? না, না, মেয়েটিকে কোনো ক্রমেই নষ্ট হতে দেওয়া চলেনা। তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনী যদি একটা সুন্দর সুস্থ জীবন পায় তা হলে এলাই বা পাবে না কেন?

এলার ঘরে গানের আওয়াজ আসছে। যদি ওখানে বড়ুয়া এসে থাকে? বড়ুয়ার মতলব ভালো না, এলাকে সাবধান করে দিতে হবে। বড়ুয়াকেও বুঝিয়ে দিতে হবে যে যে কোনো মেয়ের সঙ্গেই সে এরকম ব্যবহার করতে পারবে না।

দরজা খুলে এলা অবাক হয়ে গেল।

না, আর কেউ নেই, এলা একা একাই বসে গানের রেওয়াজ করছিল। এটা এলার দিদির ফ্ল্যাট। দিদি-জামাইবাবু বাইরে গেছেন বলে এলা কেয়ার টেকার।

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন অনেক কিছু বলবেন এলাকে। তিনি শুধু বললেন, এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলুম।

—মোটেই না। শুধু ভাবছি আমার এত সৌভাগ্যের কারণটা কী?

—তুমি গান গাইছিলে, তাই গাও, আমি শুনি।

—আপনি একদিন কী একটা ফোক সঙ-এর কথা বলছিলেন। আমি কিন্তু ফোক্ সঙ জানি না।

—তুমি যা জানো, তাই গাও।

হারমোনিয়াম নিয়ে এলা নিঃসঙ্কোচে গান ধরলো। রবীন্দ্র সঙ্গীত: মধুর তোমার শেষ যে না পাই—।

এ গানটা জ্ঞানব্রত অনেকবার শুনেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত সব পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু এই গানটা তো আবার নতুন করে ভালো লাগলো। এলার গলাটা সেরকম আহামরি কিছু না হলেও সুশ্রাব্য। চর্চা করলে ও একদিন নাম করতে পারবে।

—বাঃ, বেশ ভাল হয়েছে।

—আমি আপনার প্রশংসায় বিশ্বাস করি না। আপনি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

—না, না।

—আমি ঠিক বুঝেছি। আপনি সেই ফোক সঙটার কথাই ভাবছিলে
নিশ্চয়ই। কি সেই গানটা?

—শহরে ষোলজন বোম্বেটে করিয়ে পাগল পারা···লালন ফকিরে
গান।

—এই গানটার বিশেষত্ব কী?

—সে রকম কিছুই না। আমি যে গান বাজনার খুব একটা ভক্ত, তা
না। তবু, রেডিওতে একদিন ওই গানটা শুনে আমি যেন কী রকম হ
গেলাম। আসলে আমার একটা হারিয়ে যাওয়া বাল্যকাল আছে
কয়েকটা বছরের কথা আমার কিছুই মনে পড়ে না। এই গানটা শু
একটু একটু মনে পড়লো··কুষ্টিয়ায় থাকবার সময় একজন ফকিরে
মুখে আমি এই গানটা শুনতাম আমার দাদা মশাইয়ের কাছে আসতে
সে ফকির··। মনে হয় যেন একটু একটু করে সব মনে পড়বে এবার···
অবশ্য এত সব মনে পড়া ভালো নয়।

—কেন ভালো নয়?

—মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ইদানীং, জীবনটা যদি আবার নতুন ক
শুরু করা যেত!

-এ রকম চিন্তা আপনার মাথায় কে ঢোকালো? আপনি একজ
সাকসেসফুল মানুষ, কোনোদিকেই অভাব নেই।

—তবু তো মনে হয়।

—আপনার বাড়িতে একজন গায়ককে এনে রেখেছেন, তাই না?

—হ্যাঁ···তুমি কী করে জানলে?

এলা এবার চোখ টিপে দুষ্টু মেয়ের মতন হাসলো। তারপর বললো
জানি খবর রাখতে হয়···আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

—আমার তো কোনো গোপন কথা নেই।

—সেই গায়কের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন না। আমি ত
হলে কয়েকটা ফোক সঙ শিখে নিতে পারি। আপনি যখন ঐসব গান
এত ভালোবাসেন।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে জ্ঞানব্রত বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেবো
শোনো আমি সে কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি। তুমি আজে বাজে
লোকদের সঙ্গে ঘুরো না। তুমি মন দিয়ে গান শেখো। আমি সব ব্যবস্থ

রে দেবো। আমি যদি মাসে মাসে তোমাকে ধরো হাজার দেড়ের টাকা ই, তাতে তোমার খরচ চলে যাবে?

—অর্থাৎ আপনি আমাকে রক্ষিতা রাখতে চান?

কথাটা ঠিক একটা বুলেটের মতই জ্ঞানব্রতর বুকে লাগলো। ফ্যাকাশে য়ে গেল তাঁর মুখ।

—তুমি, তুমি আমাকে এই রকম কথা বললে।

—আপনার কথার কি এরকম মানে হয় না? আপনি শুধু শুধু মাকে প্রত্যেক মাসে অত টাকা দেবেন কেন?

—মানুষ কি মানুষকে সাহায্য করে না?

—এদেশে কি গরীব গায়কের অভাব আছে? আপনি আমায় সাহায্য রতে চাইছেন··আমি একটা মেয়ে বলেই তো? তা ছাড়া বৌদি কি াববেন?

—বৌদি?

—আপনার স্ত্রী···তিনি যদি জানতে পারেন যে আমার মতন এক য়েকে আপনি প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা দিচ্ছেন, তা হলে তিনি, ঐ মি যা বললুম, ঠিক সেই কথাই ভাববেন।

একটা বিমর্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্ঞানব্রত বললেন, আমার ভুল হয়েছে। মায় ক্ষমা করো।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই এলা তাঁর কাছে এসে বললো, আপনার মুখ খলেই বোঝা যায়, আপনি মানুষটা খুবই ভালো। সত্যিক্যরের লো।

—আমি তোমায় অপমান করতে চাইনি।

যেন জ্ঞানব্রতই বয়েসে অনেক ছোট এইভাবে এলা গায়ে হাত বুলিয়ে ন্ত্বনার ভঙ্গিতে বললো, তা আমি ঠিকই বুঝেছি। আপনি মনে দুঃখ লেন নাকি?

জ্ঞানব্রত আর কিছু না বলে এলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আপনি যা ভাবছেন, আমার অবস্থা ততটা খারাপ নয়। আমার কা পয়সার কিছু ব্যবস্থা আছে। আমার বাবা রেখে গেছেন! তবে যে মন মনে করে, মেয়েদের একটা বয়স হলেই বিয়ে করে সংসার করা চিত, সেইটাই সুখী জীবন, আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি গান

বাজনা নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। যার সঙ্গে ইচ্ছে হবে মিলবো, ইচ্ছে না হলে মিলবো না।

—আমি যাই?

—কেন! হঠাৎ উঠে পড়লেন যে।

জ্ঞানব্রতর একটা হাত নিয়ে এলা নিজের গালে ছুঁইয়ে বললো, বুঝেছি আমার ও কথাটার জন্য আপনি আঘাত পেয়েছেন। আমি কিন্তু মজা করে বলেছি।

মজা! কোনো মেয়ে নিজের সম্পর্কে এরকম একটা শব্দ প্রয়োগ করে মজা করতে পারে? জ্ঞানব্রতর সব কিছুই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

এরপর তিনি যা করলেন, সেরকম কিছু করবার কথা একটু আগেও তিনি স্বপ্নেও ভবেন নি।

এলা এত কাছে, তার শরীরের উষ্ণতা, তার সান্নিধ্যের ঘ্রাণ যেন জ্ঞানব্রতকে অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দিল। তিনি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন এলাকে।

এলা একটুও আপত্তি করলো না। পাখি যেমন তার বাসায় গিয়ে বসে সেইরকমভাবে এলা জ্ঞানব্রতর বুকের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত রইলো।

জ্ঞানব্রত যেন অন্য মানুষ। তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমায় একটু আদর করি?

এলা উঁচু করলো তার মুখটা। জ্ঞানব্রত তার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতেই এলা বার করলো তার জিভ। অর্থাৎ চুম্বনটা যেন দায়সারা কিংবা সংক্ষিপ্ত না হয়।

সেই সময়টাতেও জ্ঞানব্রত এ কথা চিন্তা না করে পারলেন না যে তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীকেও এ রকম একজন বয়স্ক লোক জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারে। উজ্জয়িনীও কি এলার মতন এত সব জানে! পি. সি. বড়ুয়াকে তিনি মনে মনে নিন্দে করছিলেন, বড়ুয়া সুযোগ সন্ধানী। কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই···। তিনিও কি নিরালায় সুযোগ নিয়ে এলাকে···

তক্ষুণি জ্ঞানব্রত নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে গেছে।

এরপর দু'দিন মন থেকে সমস্ত অন্য রকম চিন্তা বাদ দিয়ে জ্ঞানব্রত

শুধু কোম্পানীর কাজে মেতে রইলেন। যেন তিনি নিজেকে শাস্তি দিতে চান।

—কিন্তু তাঁর পুরী যাওয়া হলো না।

তাঁর কারখানায় দুটি ইউনিয়ন। এর মধ্যে যে ইউনিয়নটি বেশী শক্তিশালী, তারা হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন ধর্মঘটের নোটিশ দিল। এ সময় জ্ঞানব্রতের বাইরে যাওয়া চলে না। অবস্থা এখনো হাতের বাইরে চলে যায় নি। আপোষ আলোচনায় মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সুজাতা তৈরী হয়েই আছে। তাকে নিরাশ করা যায় না। জ্ঞানব্রত নিজেই প্রস্তাব দিলেন, সুজাতা একাই চলে যাক। হোটেল তো বুক করাই আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। যদি কয়েকদিনের মধ্যে মিটে যায়, তাহলে জ্ঞানব্রত চলে যাবেন।—

সুজাতা বললো, তাই যাই। দীপ্তি ফোন করেছিল, ওরাও এই শনিবারে পুরী যাচ্ছে। ঐ একই হোটেলে উঠবে।

দীপ্তির স্বামী মনীশ তালুকদার সুজাতাকে ছেলেবেলা থেকে চেনে। জ্ঞানব্রত পরে জানতে পেরেছিলেন যে বিলেতে ঐ মনীশ ছিল সুজাতার এক নম্বর প্রেমিক। অবশ্য তখন মনীশ ছিল মৌমাছি স্বভাবের, বিয়ের দিকে মন ছিল না। এই নিয়ে জ্ঞানব্রত কতবার মৃদু ঠাট্টা করেছেন সুজাতাকে।

—বেশ তো, ভালোই হবে তা হলে। ওদের সঙ্গে তুমি বেড়াতে টেড়াতে পারবে।

সুজাতা চলে যাবার দু'দিন বাদে এলা টেলিফোন করে জানালো, আপনি তো আলাপ করিয়ে দিলেন না। আমি কিন্তু নিজেই আলাপ করে নিয়েছি শশীকান্ত দাসের সঙ্গে।

জ্ঞানব্রত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আলাপ হলো?

—রেডিও স্টেশনে। চমৎকার মানুষ। এত সরল আর অনেক গানের ঘটক।

—হুঁ।

—উনি কলকাতা শহরের কিছুই চেনেন না। কাল আমি ওকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরটা দেখিয়ে আনলুম।

—ও !

—আমি কিন্তু ঐ 'শহরে ষোলজন বোম্বেটে' গানটার প্রথম কয়েক লাইন এর মধ্যে তুলে নিয়েছি।

—আচ্ছা ?

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন এলার সঙ্গে তিনি কোনদিন দেখা করবেন না। কিন্তু টেলিফোনটা ছাড়বার পরই তাঁর মনে হলো, কই এলা তো একবারও বললো না, আবার কবে দেখা হবে, কিংবা আমাদের বাড়িতে আসবেন !

একই সঙ্গে কাজের ব্যস্ততা আর অন্যমনস্কতা। কাজ তো করতেই হবে, অথচ প্রত্যেক দিন জ্ঞানব্রতর মনে পড়ছে এলার কথা। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে এলার বাড়িতে। মেয়েটা কি তাঁকে জাদু করেছে ? এতগুলো বছরে জ্ঞানব্রতর কখনো পদস্খলন হয় নি, আর এখন ঐ একটি মেয়ের জন্য ! সুজাতার কাছে তিনি অপরাধ করছেন।

পুরীতে দীপ্তির চোখে ধুলো দিয়ে মনীশ কি সুজাতার সঙ্গে গোপন ঘনিষ্ঠতা করতে চাইবে না ? এ সুযোগ কি মনীশ ছাড়বে ? দীপ্তির চেহারাটা হঠাৎ বুড়িয়ে গেছে, সেই তুলনায় সুজাতার শরীরের বাঁধুনি এখনো কত সুন্দর।

সুজাতা কি আগেই জানতো যে মনীশরা এই সময় পুরীতে যাবে ! সেই জনাই ওর পুরীতে যাওয়ার এত উৎসাহ ?

শশীকান্তর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি জ্ঞানব্রতর। একই বাড়িতে থাকলেও সুযোগ হয় না ! দেখা হলো রাস্তায়।

জ্ঞানব্রত কারখানায় যাচ্ছিলেন। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সিতে এলা আর শশীকান্ত। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, শশীকান্তের চুল পরিপাটি ভাবে আঁচড়ানো, এলার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। সেই হাসি আর চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। জ্ঞানব্রত পরিষ্কার দেখতে পেলেন শশীকান্তের চোখে-মুখে এলার জাদু।

তাঁর বুকের মধ্যে দুক্ দুক্ শব্দ হতে লাগলো। কঠিন হলো চোয়াল। শশীকান্ত তাঁর আশ্রিত, সামান্য একটা গ্রাম্য লোক, তার এতটা বাড়াবাড়ি ! কোথায় যাচ্ছে এখন ? এই দিকেই এলার বাড়ি। শশীকান্তর উচিত ছিল না একবার জ্ঞানব্রতর কাছ থেকে অনুমতি নেবার ?

ট্যাক্সিটা এখনো চোখের আড়ালে যায় নি, জ্ঞানব্রত তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, সোজা চলো।

যেমন ভাবেই হোক এলাকে রক্ষা করতে হবে। যার তার সঙ্গে এমন ভাবে এলার মেলামেশা কোনোক্রমেই চলতে পারে না। এলার ফাঁকা ফ্ল্যাটে এই সময় শশীকান্তকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? গান শেখার জন্য—এই দুপুরবেলা! শশীকান্ত গ্রামের লোক। এলার মতন মেয়েদের সঙ্গে ওর মেলামেশার অভ্যেস নেই, মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।

একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল এবার কোন দিকে?

এক মুহূর্তের জন্য যেন জ্ঞানব্রতর রক্ত চলাচল থেমে গেল। 'কোন দিকে' কথাটা যেন একেবারে নাড়িয়ে দিল তাঁর চৈতন্য। এ তিনি কি করছেন? এলাকে শাসন করতে গেলে যদি আবার সে একটা মর্মভেদী কথা ছুঁড়ে দেয়? সেদিন এলা বলেছিল, সে স্বাধীন থাকতে চায়। যার সঙ্গে খুশী তার সঙ্গে মিশবে…। এলা তো তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কারখানায় ইউনিয়নের সাথে তাঁর একটা গুরুতর বৈঠক বসবার কথা এখন, আর তিনি ছুটছেন একটা মেয়ের পেছনে।

পুরীতে মনীশ যদি সুজাতাকে....। মনীশ ঠিক নিভৃত সুযোগ করে নেবে, ও এখনও রীতিমতন প্লেবয় ধরনের। বিভিন্ন পার্টিতে তিনি দেখেছেন মনীশ পরস্ত্রীদের পিঠে হাত রাখে। কিন্তু সুজাতা কি রাজি হবে? তিনি যদি গোপনে এলার বাড়িতে গিয়ে তাকে চুমু খেতে পারেন তা হলে সুজাতাই বা কেন…উজ্জয়িনী কাল রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরেছে। এত রাত পর্যন্ত ও কোথায় থাকে, কার সঙ্গে মেশে। জ্ঞানব্রতরই মতন অন্য কোনো লোক যদি উজ্জয়িনীর মতন একটা অল্প বয়েসী মেয়ের মন জয় করতে চায়?

জ্ঞানব্রত একবার ভাবলেন। সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে এলাকে নিয়ে নতুনভাবে আবার জীবন শুরু করলে হয় না?

তারপরেই ভাবলেন, না, না। ঐ ষোলজন বোম্বেটেকে সব কিছু লুটেপুটে নিতে দেওয়া হবে না। আটকাতে হবে। মাথা ঠিক রাখতে হবে।

তিনি কড়া গলায় ড্রাইভারকে বললেন, কোন দিকে আবার? রোজ যেদিকে যাই সেদিকে যাবো!

জীবনের পঞ্চাশটা বছর পেরিয়ে এসেছেন জ্ঞানব্রত। তাঁর সব রাস্তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর অন্য কোনো দিকে ফেরা যাবে না।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

একটার পর একটা ট্রাম ও বাস চলে যাচ্ছে, ভিড়ের জন্য উঠতে পারছে না মানসী। হাওড়ায় পেঁছুতে বেশি দেরী করলে আবার ট্রেনে জায়গা পাওয়া যাবে না। মানসী অসহায় উৎসুকভাবে চেয়ে আছে দূরের দিকে।

রাস্তা পেরিয়ে একটি ছেলে এসে তার পাশে দাঁড়ালো। মানসী তাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু তাকালো না। ছেলেটি উসখুস করছে কখন মানসীর চোখ পড়বে তার দিকে। আর একটা ট্রাম আসতেই মানসী এগিয়ে গেল, কিন্তু সে ট্রামের দরজা দিয়ে সূঁচ গলারও উপায় নেই। ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল, হবে না হবে না।

ভিড়ের ধাক্কা এড়াবার জন্য মানসীকে পিছিয়ে আসতেই হল। সেই ছেলেটি তখন কাছাকাছি এসে বলল, মিস সেন, আজ উঠতে পারবেন না। আপনি হাওড়া যাবেন তো?

এই কথার মধ্যে হাসির কিছু নেই, কিন্তু ছেলেটার সারা মুখে ছড়ানো হাসি। মানসী মুখ না ফিরিয়েই বলল, আমাকে উঠতেই হবে।

—পারবেন না। আজ ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা ছিল। অসম্ভব ভিড়। আমিও হাওড়ায় যাব। চলুন, এক সঙ্গে হেঁটে যাওয়া যাক।

—আমার ট্রেন ছ'টা সাতাশে।

—সে ট্রেন ধরতে পারবেন না। পরেও তো ট্রেন আছে।

—আমাকে এই ট্রেনেই যেতে হবে।

—অসম্ভব। আজ একেবারে অসম্ভব। এক হয় যদি ট্যাক্সি নিয়ে যান—

মানসী এবার মুখ ফেরাল। রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারল না, সে এত ক্লান্ত। ক্লিষ্টভাবে হেসে বলল, আমি যেতে পারব কিনা তা নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বলুন তো?

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ছেলেটি। ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা

খাইনি গোছের মুখ করে বলল, আমি কিন্তু আপনাকে ডিসটার্ব করতে আসিনি। আমিও হাওড়ার দিকেই যাব কি না—

—আপনি তো থাকেন অন্যদিকে।

—হ্যাঁ, আমি বালিগঞ্জে থাকি। কিন্তু আজ হাওড়ায় যাব একটা বিশেষ কাজে। ট্রাম বাসের যা অবস্থা, আজ হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

—আপনি পুরুষ মানুষ, আপনিও ভিড়ের ট্রাম বাসে চড়তে পারেন না?

—তা হয়তো পারি। কিন্তু আপনাকে ফেলে রেখে, মানে, আপনার চোখের সামনে আমি উঠে পড়ব....। তাই ভাবছিলাম, দুজনেই যদি এক সঙ্গে হেঁটে যাওয়া যায়—তাহলে বেশি কষ্ট হয় না।

মানসী রাস্তার এদিকে ওদিকে তাকালো। শেষ বিকেলের মৌলালির মোড়ে হাজার হাজার ব্যস্ত মানুষ। অসংখ্য ট্রাম বাস-রিকশার জটলা। অফিস ভাঙার পর এখন বাড়ি ফেরা মানুষের স্রোত। ফুটবল দর্শকদের ভিড় ট্রামের ছাদ পর্যন্ত উঠেছে।

মানসী জিজ্ঞাসা করল, আপনার বন্ধুরা কোথায়?

দারুণ অবাক হবার ভঙ্গি করে ছেলেটি বলল, বন্ধুরা? মানে, কাদের কথা বলছেন?

—বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ফেলেছেন তো? তারা দূর থেকে লক্ষ্য করছে না? কত বাজী?

ছেলেটি এবার পরিষ্কার ভাবে একগাল হেসে ফেলল। বলল, মিস সেন, আপনি ঠিক ধরেছেন। দশ টাকা বাজী ফেলেছি। আমাকে জিতিয়ে দিন না, প্লীজ!

মানসী উদাসীন ভাবে বলল, অমলবাবু, আমার নাম মানসী সেন। মিস সেন বলে ডাকা আমি পছন্দ করি না।

—অফিসের সবাই মিস সেন বলেই ডাকে।

—সেইজন্যেই তো অফিসের কারুকেই আমার পছন্দ হয় না!

—আচ্ছা, আমি আর তাহলে বলব না। হাঁটলে কিন্তু আমরা এতক্ষণে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারতাম!

—আপনাকে বাজী জিতিয়ে আমার লাভ!

—যদি বলেন তো, আমরা দুজনে মিলে কোথাও বসে টাকাটা খেয়ে ফেলতে পারি।

—আর আপনি হেরে গেলে আপনার বন্ধুরা সেই টাকায় খাবে তো?

—ওরা আমার ঘাড় ধরে আদায় করে নেবে।

—আমি দুঃখিত অমলবাবু। আপনার বন্ধুরাই জিতবে। আমাকে ছ'টা সাতাশের ট্রেন ধরতেই হবে—আচ্ছা চলি!

অমলকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না মানসী। একটা বাস থেমেছে, একজন ভদ্রমহিলা ভিড় ফুঁড়ে নামতেই মানসী সেই জায়গা দিয়ে উঠে গেল। ভিড় আবার গ্রাস করে নিল মানসীকে।

বাস হাওড়ায় এসে থামতেই মানসী হন্ হন্ করে হাঁটল প্লাটফর্মের দিকে। নেহাৎ দৌড়লে খারাপ দেখায়, তাই সে দৌড়তে পারছে না। ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র দু'মিনিট বাকি আছে।

গেটের সামনে এসে মানসী ব্যাগ থেকে তাড়াহুড়ো করে মান্থলি টিকিট বার করছে, দেখল সেখানে হাসিমুখে অমল দাঁড়িয়ে। একটু অবাক হলেও এখন মানসীর গ্রাহ্য করার সময় নেই।

অমল বলল, দেখলেন তো, আপনার আগে আমি পৌঁছে গেলাম।

মানসী উত্তর দেয়নি, কিন্তু অমল তার সঙ্গে সঙ্গে গেট পেরিয়ে এসেছে। এখানে যেন অমলের সাহস একটু বেড়েছে। মৌলালির মোড়ে অফিসের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অমল একটু আড়ষ্ট বোধ করছিল। যদিও অমল জানে না, এখানেই মানসীর চেনা লোক বেশি। মানসী প্রত্যেকদিন ছ'টা সাতাশের ট্রেনে যায়—এই ট্রেনের অন্য নিয়মিত যাত্রীরা তার মুখ চেনে, হয়তো নাড়ী-নক্ষত্রও জানে। চুঁচড়োর বহু লোক আছে, তারা তো জানবেই।

মানসী বলল, পরের ট্রেন সাতটা চল্লিশে। আপনি যান না সেটায়।

—আপনাকে এটাতেই যেতে হবে?

—হ্যাঁ।

—অফিসের সবাই বলে, আপনি ঘড়ির কাঁটার মতন পাংকচুয়াল। রোজ এক সময়ে অফিস থেকে বেরোন, রোজ এক ট্রেনে বাড়ি ফেরেন—একদিন একটুও এদিক ওদিক হয় না। এক আধদিন একটু রুটিন ভাঙলে কি হয়?

—সাতটা চল্লিশের ট্রেনে গেলে আপনি বাড়ি ফিরবেন বখন ?

—লাস্ট ট্রেনে ফিরব। আমাকে যেতে হবে বলেজের কাছে। ঠি
চিনি না—আপনি যদি একটু চিনিয়ে দেন—

একটা কামরার হ্যাণ্ডেল ধরে উঠে পড়তে পড়তে মানসী বললো
স্টেশনে নেমে যে-কোনো রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করবেন। নিয়ে
যাবে।

—আপনি এই ট্রেনেই যাবেন! পরেরটায় গেলে হয় না ?

—না।

মানসীর সঙ্গে সঙ্গে অমলও উঠে পড়ল। কিন্তু কামরায় এত ভিড়
যে কথা বলার সুযোগ নেই। মানসীও বসবার জায়গা পেল না। খেলা
ভাঙার ভিড়ের ছোঁয়া লেগেছে এই ট্রেনেও। কয়েকজন নিত্যযাত্রী খুব
আগে থেকে উঠে তাশ নিয়ে বসে গেছে। একপাশে রাজনীতি ও একপাশে
খেলার আলোচনা পরস্পরকে চীৎকারে ডুবিয়ে দিতে চাইছে। এরই মধ্যে
একজন বাচ্চা ফেরিওয়ালা মানসীর কাছে এসে বলল, কি দিদি, ধূপ
নেবেন না ? সেই যে গত মাসে নিয়েছিলেন—এখনও ফুরোয় নি ?

চুঁচড়ো স্টেশনে নেমে অমল বলল, আপনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস
করে নিলেন যে আমি বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ফেলেছি ? দেখুন, এখানে তে
কেউ সাক্ষী নেই—

মানসী ধীর শান্ত গলায় বলল, অমলবাবু, এখানে আমাকে অনেকে
চেনে।

অমল একটু ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকালো। তারপর আবার
সপ্রতিভ ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে বলল, সত্যি কথা কি জানেন
চুঁচড়োতে আমার কোনো কাজ নেই। কেউ চেনা নেই। এমনি ট্রেনে
বেড়াতে ইচ্ছে হল, চলে এলাম।

—এই রকম ভিড়ের ট্রেনে কষ্ট করে আসা,—একে বেড়ানো বলে ?

—তাই বা মন্দ কি ? সন্ধ্যেবেলা তো কোনো কাজ থাকে না—কিছু
করার থাকেনা।

—সন্ধ্যেবেলা আপনার কিছু কাজ থাকে না ?

—না।

—আমার থাকে। চলি!

অমলকে আজ কিছুই বলার সুযোগ দিল না মানসী। স্টেশন থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি একটা রিকশায় উঠে বসল। অচেনা জায়গায় অমলের এত সাহস নেই যে সেও গিয়ে মানসীর পাশে বসে পড়বে। বোকার মতন দাঁড়িয়ে রইল। রিকশা ছাড়ার মুহূর্তে মানসী হেসে বলল চলি!

খানিকটা দূরে গিয়েই রিকশা থেকে নেমে পড়ল মানসী। ভাড়া দিল চল্লিশ পয়সা। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। অন্যদিন এইটুকু পথ সে হেঁটেই আসে। কিন্তু আজ অমল তার সঙ্গ ছাড়ল না। সেইজন্যই চল্লিশ পয়সা খরচ হয়ে গেল। অমলের মুখ দেখে মনে হল, সে খুব রেগে গেছে—কিন্তু সে তো জানেনা, মানসী একটুও মিথ্যে কথা বলেনি। কাল অফিসে বোধহয় পেছনে লাগবে।

কাছাকাছি একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিল মানসী। দরজা খোলার আগের সময়টুকুতে মুখ মুছে নিল রুমালে। খিদেয় পেট চিন চিন করছে। অন্যদিন প্ল্যাটফর্মে একটা কমলা লেবু টেবু কিনে নেয়। আজ অমলের জন্য সেটাও হল না। উল্টে চল্লিশ পয়সা খরচ হয়ে গেল মিছামিছি।

এ বাড়ির দুটি মেয়েকে মানসী পড়ায়। শ্রীলেখা পড়ে ক্লাশ টেনে, মঞ্জু ক্লাস থিতে। আগে শুধু শ্রীলেখাকেই পড়াতো—কয়েক মাস ধরে মঞ্জুও আসতে শুরু করেছে—এজন্য মানসীর মাইনে তিরিশ থেকে বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ করা হয়েছে। ওদের পড়াশুনোর এত তফাৎ যে এক সঙ্গে পড়াতে রীতিমত অসুবিধে হয়। তাছাড়া দুজনে ঝগড়া করে। কিন্তু মানসীর আপত্তিতে বাড়ির গিন্নি কান দেন নি। মানসীও বেশি জোরালো আপত্তি করতে সাহস পায় না—তাহলে টিউশনিটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এমনিতেই তো ছাত্রীদের মা মাঝে মাঝে শুনিয়ে দেন যে অফিসে চাকরি করা মাস্টারনীর বদলে কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে রাখলে মেয়েদের পড়াশুনো বেশি ভাল হত। মানসীও এক সময় বছরখানেক এখানকার স্কুলে পড়িয়েছে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা গণ্য হয় না।

বসবার ঘরটাই পড়ার ঘর। বাড়ির লোকজন অনবরত এই ঘরের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে। সেই সময়টা আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে মানসী।

কখনো এমনও হয়, বিশেষ প্রয়োজনীয় কোনো লোক এলে ছাত্রীদের বাবা ঐ ঘরেরই একপাশে কথা বলেন তাঁর সঙ্গে—আর মানসীকে নিচু গলায় পড়িয়ে যেতে হয়।

শ্রীলেখা মেয়েটি বেশ পাকা। পড়াশুনো বাদে অন্য অনেক কিছুতেই তার কৌতূহল। মানসীকে সে একটুও ভয় পায় না। রাজেশ খান্না বিয়ে করেছে কিনা কিংবা অপর্ণা সেন নাকি চুল বাঁধার জন্য আলাদা চীনে হেয়ার ড্রেসার মাইনে দিয়ে রেখেছে—এসব প্রশ্ন সে অবলীলাক্রমে জিজ্ঞেস করে। আর মঞ্জু খালি ফিক ফিক করে হাসে—মানসী একটু অন্যমনস্ক হলেই সে পড়া ছেড়ে উঠে পালিয়ে যায়।

শ্রীলেখার দাদা রজত বয়েসে বোধ হয় দু'এক বছর ছোটই হবে মানসীর চেয়ে। সেও আসে তার সঙ্গে ফোক্করমি করতে। মানসীর ঘড়ি সর্বক্ষণ টিক টিক করে। চোখ চলে যায় সেইদিকে। উঠতে উঠতে তার প্রায় সাড়ে নটা হয়ে যায়। সাড়ে আটটা আন্দাজ ভেতর থেকে এককাপ চা আসে তার জন্য। বিস্কুট-টিস্কুট কিছুই না। কিন্তু ক্লান্ত থাকে বলে, চা-টা ভালই লাগে তার। শুধু সে মনে মনে প্রার্থনা করে, কোনোদিন কি চা-টা আসবার পরেই পেতে পারে না? এত রাতে চা খেয়ে বাড়ি ফিরে আর ভাত খাওয়ার রুচি থাকে না।

নটা নাগাদ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরে রজত। সেই সময় মিনিট পাঁচেক মানসীর সঙ্গে ইয়ার্কি করা তার বাঁধা। রজতের বাবার সিমেন্টের দোকান আছে চন্দননগরে। প্রায়ই তিনি চুঁচড়োয় না ফিরে চন্দননগরেই থেকে যান। লোকে বলে সেখানে নাকি তাঁর একটি রক্ষিতাও আছে। সে যা-ই থাক, আর কিছুদিন পর রজতই সেই দোকানে বসবে। তার চাকরি বাকরি করার ভাবনা নেই, সেইজন্য এই দু'একটা বছর সে খুব পলিটিকস করে নিচ্ছে। শহরের যে-কোনো বড় রকমের প্রতিবাদ মিছিলে দেখা যায় রজতকে।

রজত ঘরে ঢুকে বলল, এই যে, আজ কলকাতার খবর কি?

মানসী বলল, নতুন কিছু খবর তো জানি জানি না। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা ড্র হয়েছে—

—আপনি খেলা দেখতে গিয়েছিলেন?

—না। ট্রেনে শুনলাম!

—ও খবর তো জানিই। আর কোনো খবর নেই? আপনার কাছ থেকে লেটেস্ট খবর পাব ভাবলাম। দুদিন কলকাতায় যায়নি—

মানসী রোজ সকালে কলকাতায় অফিস যায়, সন্ধ্যেবেলা চলে আসে। কলকাতার খবর তো তার কিছু চোখে পড়ে না। সে শুধু দেখে ট্রাফিক জ্যাম, মাঝে মাঝে কারেন্ট অফ হয়ে যায়—আর কদাচিৎ শুনতে পেয়েছে দূরে দু একটা বোমার আওয়াজ। এ ছাড়া কলকাতার খবর সে কি জানবে?

—আপনাদের অফিস ওয়ার্ক-টু-রুল-এর প্রস্তাব নেয় নি?

—সে-রকম তো কিছু শুনিনি।

—ইউনিয়নেয় সঙ্গে কানেকশান নেই আপনার? সমস্ত মেহনতী মানুষের উচিত ইউনিয়নকে অবলম্বন করে ফাইট করা—

রজতের গলার আওয়াজ পেলেই ভেতর থেকে তার মা ডাক পাঠান। আজও ডাকলেন, জিতু, এই জিতু, শোন—। তাঁর ছেলে মাস্টারনীর সঙ্গে গল্প করবে, এটা তিনি চান না।

রজত চলে যাবার পর শ্রীলেখা চোখ বড় বড় করে মুচকি হেসে বললে, আজ দাদা খুব বকুনি খাবে মার কাছে!

মানসী বলল, ঠিক আছে। তোমার ব্যাখ্যাটা লেখা হয়ে গেছে?

সে কথা গ্রাহ্য না করেই শ্রীলেখা বললে, কেন বকুনি খাবে জানেন? দাদা আজ ডলিদির সঙ্গে দুপুরে সিনেমায় গিয়েছিল। মা দেখে ফেলেছে।

মঞ্জু মিটমিট করে হাসল। মানসী তার বই গুছিয়ে দিয়ে বলল, মঞ্জু, তোমার পড়া হয়ে গেছে। তুমি এবার যাও!

মঞ্জু তখন আর যেতে চায় না। অন্য সময় সে পড়া ফেলে পালিয়ে যায়, এখন সে দিদির গল্প শুনবে।

মানসী একটু কড়া হবার চেষ্টা করে বলল, শ্রীলেখা, ওসব বাজে কথা রাখো! ব্যাখ্যাটা লেখা হল না এখনো?

—শুনুন না! দাদা না, ডলিদিকে চিঠি লেখে। আমিই তো দিয়ে এসেছি।

মানসী ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে হেলান দিল। এ বাড়ির ছেলে মেয়েদের কোনো রকম নৈতিক শিক্ষা নেই। কারো শাসন ওরা মানে না। এক এক সময় এমন এমন খারাপ কথা উচ্চারণ করে যে মানসী শুনে আঁৎকে ওঠে।

এমনকি মঞ্জু পর্যন্ত। অথচ মঞ্জুকে দেখতে বেশ, সরল ঢলঢলে মুখখানি শ্রীলেখা যদিও ক্লাস টেনে-এ পড়ে, কিন্তু তার বয়েস কুড়ির কাছাকাছি বাড়ন্ত শরীর। তার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার আশা খুবই কম—আজকাল এই টোকাটুকির যুগে বই খুলে দিলেও বোধ হয় শ্রীলেখ কিছুই লিখতে পারবে না। সেইজনাই পড়াশুনোয় তার মন নেই—পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা।

শ্রীলেখার বাবাকে মানসী খুব কমই দেখেছে। ভদ্রলোক খাঁটি ব্যবসায় ধরনের। চন্দননগর-চুঁচড়ো মিলিয়ে তিনখানি বাড়ি করেছেন। কিন্ত শ্রীলেখার মাকে দেখে মানসী এক সময় অবাক হয়েছিল। এ বাড়ির পক্ষে বেমানান। শ্রীলেখার মা এম এ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলেন, পরীক্ষা দেনি অবশ্য। মানসী এ বাড়তে পড়াচ্ছে প্রায় পাঁচ বছর, প্রথম প্রথম শ্রীলেখার মাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। কত গল্প করতেন এসে—কত বই টইয়ের কথা বলতেন রকম স্ত্রী থাকতেও শ্রীলেখার বাবা অন্য মেয়েমানুষের জন্য কেন যান মানসী বুঝতেই পারে না। শ্রীলেখার মা-ও আজকাল হঠাৎ বদলে গেছেন একেবারে। স্বামীর দুর্মতির জন্যই বোধহয়। আজকাল তিনি বে খিটখিট করেন—টাকা পয়সা সম্পর্কে কৃপণ হয়েছেন—বই-টই পড়া তে একদম ঘুচে গেছে। মানসী মাঝে মাঝে ভাবে, এদের টাকা-কড়ির অভা নেই, তবু এদের কতরকম ঘোলাটে সমস্যা।

সাড়ে নটার সময় বাড়ি ফিরল মানসী। তার মা তার জন্য দরজা কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন রোজ। এই সময় পথ-ঘাট অনেক ফাঁকা হয়ে য —কিন্তু মানসীর ভয় করে না। জীবনের অনেকগুলো বছর ধরে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছে—ভয়ের কি আছে? মা অবশ্য দাঁড়াবেনই মানসী বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না।

মানসী বাড়ি ফেরা মাত্র তিনি বললেন, রঞ্জু আজ আবার পা ভে এসেছে। এ ছেলেকে নিয়ে যে আমি কি করি—

মানসী থমকে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখ জ্বালা ক উঠল তার। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, কি করে ভাঙল

মা ভয় জড়ানো গলায় বললেন, ওতো বলছে, ফুটবল খেলতে গি ভেঙেছে। শ্রীরামপুরে নাকি খেলতে গিয়েছিল। জ্বরও এসেছে খুব—

—ডাক্তার ডেকেছিলে ?

—না। কাল সকালে যদি জ্বর না কমে।—

চল দেখি।

মা তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তুই আজ আর ওকে বকাঝকা করিস না।

মানসী আবার দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, না, বকব না। দেখে আসি।

বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে আছে মঞ্জু। ষোল বছর বয়েস। ডান পায়ে অনেকখানি হলুদ চুন লাগানো। তার কপালে জলপটি দিচ্ছে মানসীর ছোট বোন তাপসী। মানসী কাছে এসে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ঘুমিয়ে পড়েছে ?

তাপসী ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

—খেয়েছে তো ?

কিছু খেতে চাইল না।

মা বললেন, থাক্, আজ আর কিছু না খেল। জ্বর আছে গায়।

মানসী তাপসীকে জিজ্ঞেস করল, কিছু ওষুধ-টষুধ দিয়েছিস্ ?

—দুটো নোভালজিন।

—ঠিক আছে। ঘুমোক। আলো নিবিয়ে দে বরং—

নিজের ঘরে এসে মানসী চুলের ক্লিপ-কাঁটা খুলল। গলার সরু হারটা খুলল। তারপর আটপৌরে শাড়ি, ব্লাউজ ও তোয়ালে নিয়ে ঢুকল বাথরুমে। যত রাতই হোক, বাড়ি ফিরে তার গা ধোয়া চাই। সারাদিনে কত ময়লা জমে। ধুয়ে না ফেললে রাত্রে তার ঘুম আসে না।

বাথরুমে একটা ছোট আয়না আছে। অনেক কাল আগের। বাবা বাথরুমে দাড়ি কামাতেন। এখন পারা চটে গেছে, ভাল করে মুখ দেখা যায় না।

মানসী সেই আয়নার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। আলতোভাবে হাত বোলালো নিজের চিবুকে-চোয়ালে। তারপর শাড়ি-ব্লাউজ খুলতে গিয়েও থমকে গেল। কি ভেবে সে আয়নার সঙ্গে চেপে ধরলো তার গাল। ঠাণ্ডা লাগছে। বড় ভাল লাগছে। সারাদিনে এই প্রথম ভাল লাগল।

এখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। মানসীর দু চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপ টপ করে।

দুই

সকালবেলা উঠেই মানসী শুনল, রঞ্জু ভাঙা পা নিয়েই কখন যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। কারুকে কিছু বলেও যায় নি।

মানসী চুপ করে শুনল। এখন রঞ্জুর জন্য খোঁজাখুঁজি করতে যাওয়া বৃথা। কাছাকাছি যদি সে থাকত, তাহলে সেকথা বাড়িতে বলেও যেত। মাত্র ষোলো বছরের ছেলে, এখন তার একটা আলাদা জগত আছে। সে কোথায় কখন যাবে, সে কথা অভিভাবকদের বলার দরকার মনে করে না। অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা করা কাজ, তারা তা করবেই।

মা আপন মনে গুন গুন করে কি সব বলছেন। মানসী ওর সবচেয়ে ছোট বোন হিমানীকে বলল, যা তো, দেখে আয়—বাবলু বাড়িতে আছে কিনা। বাবলু যদি না থাকে, তাহলে বুঝব বাবলুর সঙ্গেই কোথাও গেছে।

মা বললেন, গায়ে জ্বর। ভাঙা পা নিয়ে···

মানসী হঠাৎ রেগে উঠল। মুখ ঝামটে বলল, মোটেই ওর পা ভাঙেনি। মচকে টচকে গেছে। সত্যি সত্যি পা ভাঙলে কেউ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে?

হিমানী এসে খবর দিল, বাবলু বাড়িতে নেই।

রঞ্জুর জন্য আর একটুও চিন্তিত মনে হল না মানসীকে। কাঠের আলমারির ওপর রাখা ছোট টেবল্ ক্লকটার দিকে তাকিয়ে বলল, তা হলে কে বাজারে যাবে?

তাপসী বলল, আমি বাজার করে এনে দিচ্ছি।

—না, তোকে যেতে হবে না।

—কেন, দিদি, দাও না, আমি চট্ করে কাজটা করে আসছি।

—না, তোর পড়াশুনো আছে না? সামনেই পরীক্ষা, তুই পড়তে বোস্—

তাপসীর বয়স উনিশ, সে এবার পার্ট টু দেবে। তার স্বাস্থ্য একটু বেশি ভাল, পুরুষরা তার দিকে লোভীর চোখে তাকাবেই। সে বাজারে

গেলে নানা লোকে নানা মন্তব্য করে। মানসী এটা টের পেয়েছে। রঞ্জু বাড়ির কোনো কাজ করে না। শুধু সকালবেলার বাজার করা—তাও নিয়মিত তাকে দিয়ে হয় না। আজ আর সে কারুকে কিছু না বলে চলে গেল। মানসী রঞ্জুর কথা একটু ভাবল। তারপর মানসী উঠে পড়ে বলল, মা, থলি টলি দাও, আমিই বাজারটা করে আনছি!

মা বললেন, থাক্, আজ না হয় বাজারে না গেলি! ডাল ভিজিয়েছি, বড়া করে দেব। আর আলু সেদ্ধ—

—তোমার ছেলেই তো নিরামিষ খেতে পারে না। তুমি রোজ বলো! এত করছি, আর একটু মাছ খাওয়াতে পারব না? কারুর কথা সে না শুনুক, খেতে তো আসবেই!

মা আবার নিষেধ করল, মানসী শুনল না। জেদ করেই বাজারে বাজারে চলে গেল। ফিরে আসার পর আর তার সময় থাকে না। চান খেতে বসতে হয়। ন'টা পাঁচে ট্রেন। মা তাড়াহুড়ো করে মাছ কুটে ভেজে দিতে চেয়েছিলেন, মানসীর খাবার সময় হল না। গরম তেলে মাছভাজার চড়বড় শব্দ হচ্ছে যখন, মানসী তখন অফিসে বেরিয়ে গেল।

তাপসীর কলেজ এক ঘণ্টা বাদে। চান করতে তার একটু বেশি সময় লাগে। তা ছাড়া, বাড়ির অন্যদের কাপড় কাচাকাচির ভার তার ওপর। দিদি বেরিয়ে যেতেই বই মুড়ে উঠে পড়ল।

তাপসী খেতে বসার পর বেধে গেল তুলকালাম কাণ্ড। দিদি মাছ খেয়ে যায় নি, সুতরাং তাপসীও মাছ খাবে না।

মা বললেন, বেশি বাড়াবাড়ি করিস না তো। তোর দিদি এবেলা খায়নি তা ওবেলা খাবে! তুই অত বেশি বেশি করছিস কেন? দিদি তোকে খেতে বারণ করেছে?

—বারণ না করুক্। আমি খাব না!

এ বেলার রান্না মাছ তাপসী ও বেলা খেতে পারে না। তার আঁশটে গন্ধ লাগে। মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে তাপসী মাছ না খেয়েই পাতে জল ঢেলে দিতে, মা একেবারে জ্বলে উঠলেন। মানসী যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ মা বেশি মেজাজ দেখান না। মানসী চলে গেলে সবাই যে-যার স্বভাবের খাপ খুলে ফেলে।

মা বললেন, কথা শুনলি না? তোর বেশি বেশি তেজ হয়েছে আজকাল, না?

তাপসী বলল, কেন, দিদির একলার তেজ থাকবে? আমাদের থাকতে পারে না? দিদি আমাদের রোজগার করে খাওয়াচ্ছে বলে—সব সময় এত মেজাজ দেখাবে? আমি বাজারটা করে আনলে কি ক্ষতি হত? দিদি সব কাজ একা করে বাহাদুরীও নেবে আবার মেজাজও দেখাবে?

—দিদির সঙ্গে তুলনা করতে লজ্জা করে না তোর? তোরা দিদির পা ধুয়ে জল খাওয়ারও যোগ্য নয়! এতবড় সংসারটা সে একলা চালাচ্ছে—তোরা হলে পারতিস?

—দিদি বুঝি সারাজীবনই এই সংসারের জোয়াল টানবে?

—তা ছাড়া উপায় কি? তোদের দ্বারা তো কোনো উপকার হবে না! তোদেরও গতি করতে হবে ঐ দিদিকেই। তোরা মেয়ে না হয়ে ছেলে হতে পারলি না? ভগবান দিয়েছেনও আমার কপালে—

এঁটো কুড়িয়ে থালা হাতে নিয়ে তাপসী চলে গেল কলঘরে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, ছেলে তো আছে তোমার একটা। সে তোমায় কত উপকার করছে, তা তো দেখতে পাচ্ছি! তার জন্য রোজ মাছ আনো, তার জন্য নতুন জামা প্যান্ট কিনে দাও—আর সে এ দিকে পড়াশুনো না করে দেশ উদ্ধার করছে।

মায়ের চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললেন, তোরা রঞ্জুর নামে কিছু বলবি না, এই আমি বলে দিলাম। তোরা তাকে খাওয়াতে না পারিস, আমি লোকের বাড়িতে গিয়ে ঝি গিরি করব। একটা মোটে ছেলে—

—অত আদর দিয়ে দিয়েই তো ওর মাথাটা খেলে!

—তুই চুপ কর তো!

—আমি তো চুপ করেই আছি।

ভাঙা পা নিয়ে ছেলেটা কোথায় চলে গেল, কেউ তার খোঁজও নিলি না একবার।

—খোঁজ করার কি আছে? খাওয়ার সময় সে ঠিক ফিরে আসবে। আর কেউ তো তাকে আদর করে মাছ ভাত খাওয়াবে না?

—আবার তুই মাছের খোটা দিচ্ছিস?

—দেব না! দিদি এত কষ্ট করে টাকা রোজগার করছে, আর তোমার ছেলের মাছ ছাড়া ভাত রোচে না মুখে। দিদির কষ্টটা সে বোঝে? বাড়ির কথা সে একটুও ভাবে?

মা তর্ক থামিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাপসী এঁটো বাসন কটা ধুয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। তারপর কলেজ যাবার জন্য সাজগোজ।

তাপসীর চেহারায় এমন একটা আলগা লাবণ্য আছে যে সাধারণ শাড়িতেও তাকে বেশ ভাল দেখায়। তাপসী যত্ন করে সুন্দরভাবে চুল বাঁধতে জানে। এত অভাব টানাটানির মধ্যেও সে শাড়ি ও ব্লাউজ ম্যাচ করে রাখে। অতিকষ্টে পয়সা জমিয়ে ক্রিম ও পাউডার কিনে কৃপণের মতন খরচ করে।

কলেজের বই খাতা নিয়ে তাপসী যখন বেরোল, তখন তাকে দেখে বোঝাই যাবে না যে, তাদের সংসারটা পিতৃহীন, দিদির রোজগারে সংসার চলে, সামান্য মাছ খাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়। তার আর পাঁচজন সচ্ছল বান্ধবীর সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই, বরং তার চেহারাটা সহজেই চোখে পড়ে।

বেশিক্ষণ কান্নার সময় নেই, মা আবার রান্নাবাড়িতে মন দিলেন।

ছোট মেয়ে হিমানী খুব কম কথা বলে। ঝগড়াঝাটির সময় সে ধারে কাছে থাকে না। তার বয়স চোদ্দ, ক্লাশ এইটে পড়ছে। এ বাড়ির মধ্যে এখন পর্যন্ত সে-ই পড়াশুনোয় সবচেয়ে ভাল। বই কেনার কথা সে দিদিদের কখনো বলে না, লেখার কাগজ ফুরিয়ে গেলে সে কথাও জানায় না। কি করে সে কাজ চালিয়ে দেয় বুঝতে পারে না কেউ, অথচ প্রতি বছর সে ক্লাসে ফার্স্ট বা সেকেণ্ড হয়।

হিমানী এক মনে বসে বসে কোশ্চেনের আনসার লিখে যাচ্ছিল, এমন সময় তার হঠাৎ খুব পেট ব্যথা করে উঠল। এরকম ব্যথা আজকাল তার প্রায়ই হয়। এমন অসহ্য ব্যথা যে কিছুতেই আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। এই পেট ব্যথার কথাও সে কারুকে বলে নি। ডাক্তার ডাকতে গেলেই তো পয়সা খরচ হবে—হিমানীর জন্য এ সংসারে পয়সা খরচা সবচেয়ে কম। তার এই চোদ্দ বছরের জীবনেই সে নিজের জন্য একটা আলাদা পৃথিবী করে নিয়েছে! তার দুঃখ, তার আনন্দ সব কিছুই তার একার।

পেট ব্যথার জন্য হিমানীকে লেখা ছেড়ে উঠতেই হল। দম বন্ধ করে ঘুরতে লাগল এ ঘর ও ঘর। তার মুখ চোখ লাল হয়ে এসেছে। হিমানী অবশ্য জানে, ব্যথাটা দশ পনেরো মিনিট বাদেই আস্তে আস্তে কমে যাবে। সেই পর্যন্ত সহ্য করাই কষ্টকর। কে যেন তাকে বলেছিল, নুন আর জল খেলে পেট ব্যথা কমে। কিন্তু এখন রান্নাঘরে গিয়ে নুন নিতে গেলেই মা অনেক কথা জিজ্ঞেস করবেন। অত কথার উত্তর দিতে পারবে না সে।

হিমানী তাকে তাকে রইল। মা রান্নাঘর ছেড়ে একবার অন্যদিকে যেতেই হিমানী তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে এক খাবলা নুন তুলে মুখে ভরে দিল, জল খেয়ে নিল ঢক ঢক করে। ব্যথা তাতে একটুও কমে না।

নিজের ঘরে ফিরে এসে হিমানী আবার জোরে জোরে পায়চারি করছে। অন্যমনস্ক হতে পারলে তবু ব্যথাটা কম লাগে। দেয়ালে ঝোলানো তার বাবার ছবি। হিমানী ছবিটার সামনে দাঁড়াল। বাবাকে হিমানীর একটু একটু মনে পড়ে। বাবা যখন মারা যান, তার বয়েস তখন মাত্র সাত বছর। বাবা অফিস থেকে ফিরে রোজ তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন, বাবা ওকে ডাকতেন মানী সোনা বলে। বাবা বলতেন, মানী সোনা, তুমি বড় হয়ে কি হবে বলো তো? এরোপ্লেনের পাইলট হবে না জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে? আজকাল মেয়েরাও ওসব হয়। মোটকথা, তোমাকে অন্যদের থেকে আলাদা হতে হবে!

হিমানী কিন্তু বুঝতে পারে না—এরোপ্লেনের পাইলট কিংবা জাহাজের ক্যাপ্টেন কি করে হওয়া যায়! গরিবরাও কি ওসব হতে পারে? হিমানীর শুধু একমাত্র ইচ্ছে বড় হয়ে ওঠা। যত তাড়াতাড়ি সে বড় হয়ে উঠবে, তত তাড়াতাড়ি সে নিজের ব্যবস্থা করে নেবে। সংসারের বোঝা হয়ে থাকবে না!

আশ্চর্য, বাবার এই সব কথা মনে আছে, কিন্তু বাবার মৃত্যু দিনটার কথা হিমানীর একদম মনে নেই। অনেকবার সেই গল্প শুনেছে অবশ্য, কিন্তু তার একটুও মনে পড়ে না। চুঁচড়োয় আসবার আগে তারা কলকাতার বরানগরে ভাড়াবাড়িতে থাকত, সে কথাও একটু একটু মনে পড়ে। বরানগরে তাদের বাড়িটার সামনেই ছিল একটা মাংসের দোকান—আস্ত আস্ত পাঁঠা ঝোলানো থাকত—আর তার সামনে কতগুলো কুকুর—

বাবা মারা গিয়েছিলেন চুঁচড়োর বাড়িটা তৈরি হবার ঠিক দেড়বছর পরে। স্টেশন থেকে কয়েকজন চেনা লোক ধরাধরি করে বাবাকে নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে, বাবার তখন জ্ঞান ছিলনা। ট্রেনের মধ্যেই স্ট্রোক হয়েছিল। তার দুদিন পরেই··। এত সাধ করে বাবা বাড়িটা বানালেন, কিন্তু নিজে ভোগ করে যেতে পারলেন না। আশ্চর্য, একজন মানুষ না থাকলেই কত কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়। মা কিরকম হঠাৎ বুড়ি হয়ে গেলেন। বাড়িতে কেউ কারুর কথা শোনে না। দিদির খুব শখ ছিল এম এ. পাশ করে কলেজে প্রফেসারি করবে, কিন্তু এম, এ, পড়া আর হল না দিদির।

পেট ব্যথা অনেকটা কমেছে, হিমানী আবার পড়াশুনা নিয়ে বসল। মা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, হ্যাঁরে, তুই চান করতে গেলি না এখনো? ইস্কুল যাবি না?

হিমানী বলল, আজ ইস্কুল নেই আমার।

—কেন, ইস্কুল নেই কেন?

—আজ স্টুডেন্টস স্ট্রাইক।

মা চিন্তিত হয়ে বললেন, তা হলে পুসী কলেজে গেল কেন? কলেজ স্ট্রাইক হবে না?

—তা জানি না। হবার তো কথা।

—পুসী আবার স্ট্রাইক-ফ্রাইকের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। যা বিপদ চার-দিকে। আমার হয়েছে যত জ্বালা। ছেলেটা কোথায় গেল—

তিন

কলেজের আর দুটি মেয়ের সঙ্গে তাপসী প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন লেট। অথচ তিনটের মধ্যে তার কলকাতায় পৌঁছুবার কথা।

তাপসী হঠাৎ দেখতে পেল উল্টোদিকের প্লাটফর্মে তার ছোটভাই রঞ্জু কয়েকজন লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাপসী বান্ধবীদের ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, এই রঞ্জু! রঞ্জু!

রঞ্জু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো দেখতে পেল দিদিকে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। আবার কথা বলতে লাগল লোকগুলোর সঙ্গে। তারা রঞ্জুর চেয়ে বয়েসে অনেক বড়।

তাপসী তার বান্ধবীদের বলল এখনো তো সিগন্যাল দেয় নি। তোরা দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি।

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, ঐ ছেলেটা কে রে?

তাপসী সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, দেরী হবে না. আমি এক্ষুনি আসব।

ওভারব্রীজ পেরিয়ে ওদিকে যেতে যেতেই তাপসী দেখল রঞ্জু সেই লোকগুলোর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছে। তাপসী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধমকের সুরে ডাকল, এই রঞ্জু? ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না?

রঞ্জু সঙ্গীদের থেকে একটু পিছিয়ে এসে রুক্ষ গলায় বলল, কি হয়েছে কি? ডাকছিস কেন?

—তোর গায় জ্বর, তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিস?

- এখন জ্বর নেই।

---তা বলে তুই কারুকে কিছু না বলে চলে আসবি?

- বলব আবার কি! আমার কাজ ছিল।

—মা চিন্তা করছেন খুব। তুই বাড়ি যাবি কখন?

—কখন ফিরতে পারব কোনো ঠিক নেই। মাকে বলে দিস্—

- আমি কি করে বলব। আমার তো ফিরতে দেরী হবে। তুই একবার বাড়ি ঘুরে আয়—

--আমার সময় হবে না। একটু আগে বাবলুকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।

—কেন ওকে ধরেছে কেন?

যেন এই প্রশ্নটা অত্যন্ত অবান্তর, তাই রঞ্জু কোন উত্তর দিল না। এগিয়ে গেল হন্‌হন করে। তাপসী দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার ছোট ভাই, সবে ষোলো বছর বয়স, সে এখনই কারো কথা শোনে না। ও বলে গেল, ওর কাজ আছে। ঐটুকু ছেলের আবার কি কাজ! বয়েসে বড় সব লোকদের সঙ্গে মেশা চাই। কি যে করে কে জানে! রঞ্জু বাড়ির অন্য কারুকে গ্রাহ্য করে না, তাপসীকে তো সে বরাবরই তুই তুই

বলে। একমাত্র মানসীকেই আগে একটু ভয় করতো— এখন সে মানসীকে এড়িয়ে চলে।

আবার ওভারব্রীজ পেরিয়ে তাপসী ফিরে গেল তার বান্ধবীদের সঙ্গে।

তাপসী যখন হাওড়ায় পেঁছোল তখন তিনটে বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। ওর অন্য দুজন বান্ধবী চৌরঙ্গিতে ইংরেজি সিনেমা দেখার জন্য এসেছিল। অনেক দেরী হয়ে গেছে—এখন টিকিট না পাওয়া গেলেও ওরা কিছুক্ষণ বেড়াবে। ওরা দ্রুত চলে গেল বাসের দিকে। তাপসী ওদের সঙ্গে যাবে না। ওরা অনেক টানাটানি করলো তাপসীকে কিন্তু তাপসী একটা বিশেষ কাজের অজুহাত দেখালো। ওদের সঙ্গে বাসস্টপ পর্যন্ত গিয়ে ও আবার ফিরে এল স্টেশনে।

তাপসী চলে এল বড় ঘড়িটার নিচে। হতাশ ভাবে এদিক ওদিক তাকালো। দশ মিনিট দেরী হয়ে গেছে তার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই।

মুখভর্তি পান একজন মোটাসোটা মহিলা কোন দিক থেকে যেন এসে বললেন, এই যে, এসেছ? বাবাঃ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল!

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাপসীর! বলল, মল্লিকাদি, কি করব, ট্রেন যে লেট।

—তা বুঝেছি! আমার আবার এসব ভিড়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে না। তুমি তো ঠিকানা দিলে বাড়ি চিনতে পারবে না, তাই আমাকে আসতে হল—

—আপনাকে কষ্ট দিলাম খুব!

—চল, চল—

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওরা উঠে বসল বাসে। নামল এসে আহিরী-টোলায়। গলির মধ্যে বাড়ি, তার তিনতলায় মল্লিকার ঘর। একখানাই ঘর, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দরজা, পেছনের বারান্দায় ঢাকা দিয়ে রান্নার জায়গা। ঘরখানা বেশ ঝকঝকে তকতকে সাজানো। জিনিসপত্র ঠাসা। মস্তবড় খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবল। আবার তিন চারখানা চেয়ার ও ছোট একটা টেবিল রয়েছে।

ঘরে ঢুকে মল্লিকাদি বললেন, বসো। চা-টা খাবে নাকি?

—না, না, আপনাকে ওসব করতে হবে না।

—ভদ্দরলোকরা পাঁচটার সময় আসবেন। কথাবার্তা তখুনি সব বলে নেবে।

—মল্লিকাদি, আমি পারব তো?

—না পারবার কি আছে? ছোট্ট পার্ট। তিন সীনে পার্ট আছে তোমার।

—কিন্তু আমি তো কোনোদিন অভিনয় করি নি।

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তৈরি করে নেব। আর ডিরেক্টার আছে স্বপন চৌধুরী—ভাল ট্রেনিং দেয়—ওর হাত দিয়ে কত মেয়ে বেরিয়ে গেল। ভাল কথা, তুমি গান জান তো?

—না।

—জান না? এই রে, আমি যে ওদের বলেছি গান জানা মেয়ে জোগাড় করে দেব!

তাপসীর মুখটা শুকিয়ে গেল। অসহায় ভাবে বললে, তাহলে হবে না?

মল্লিকা তীক্ষ্নভাবে তাকিয়ে রইল তাপসীর দিকে। তারপর বলল, একটুও গান জান না? আজকাল তো অনেক মেয়েই একটু-আধটু—

তাপসী লাজুক ভাবে বলল, শিখিনি কখনো। তবে শুনে শুনে সুর তুলতে পারি। কিন্তু সেটুকু জানা দিয়ে স্টেজে গাইতে পারব না।

—স্টেজের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। কী রকম জান, এক লাইন করো তো—

তাপসী মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

মল্লিকা বলল, হার্মোনিয়াম চাই! খাটের নিচে আছে, টেনে নাও।

—আমি হার্মোনিয়াম বাজাতে জানি না—

—তাহলে খালি গলাতেই গাও।

তাপসী তবুও চুপ করে আছে। মল্লিকা হেসে ফেলে বলল, কি, লজ্জা করছে? আমার সামনেও লজ্জা?

—মল্লিকাদি, গান গাইতে সত্যি আমার লজ্জা করে। আমি ভাবতে পারি না।

—দ্যাখো বাপু, লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে নয়। ওসব থাকলে এ লাইনে সুবিধে হবে না। গান গাইব, তাতে আবার লজ্জা কি!

তাপসী কাঁপা কাঁপা গলায় গাইল, এ মণিহার, আমার নাহি সাজে···।

তাপসী অন্য সময় যেমন গায়, এখন নার্ভাস হয়ে তার থেকে খারাপ হল। গান গাইতে তার মনে পড়ল দিদির কথা। মানসী একসময় সত্যি ভাল গান গাইত। তাদের বাড়িতে মানসীরই ভাল গানের গলা। বাবা বেঁচে থাকতে মানসী মাস্টার রেখে গান শিখত। সে সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কতদিন মানসী ভুলেও এক লাইন গান গায় না।

তাপসীর ঐ গান শুনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মল্লিকা। বলল, এইতো যথেষ্ট ভাল গলা। এতেই ঢের ভাল চলবে। এর থেকে কত খারাপ খারাপ গলাতেও সব গান গেয়ে যায়।

—আমাকে কি নতুন গান শিখে গাইতে হবে?

—না, না, এটাই গেয়ে দেবে। বইতে আছে, মেয়েটা একলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গান গাইছে। কি গান গাইছে, সে কথা তো লেখা নেই। এ হচ্ছে অফিসের থিয়েটার—এতে খুব ভাল কিছু হবার তো দরকার নেই। কোনো রকমে কাজ চালিয়ে দিলেই হল। অফিসের বাবুদের থিয়েটার করার শখ হয়, সেই শখটা মিটলেই হল। যা পার্ট করেন এক একজন সব!

—রিহার্সাল দিতে কোথায় যেতে হবে?

—ড্যালহাউসিতে আপিস। ব্যাঙ্কের ক্লাব। সেখানে রিহার্সাল হবে সাড়ে পাঁচটার পর। মোটমাট পাঁচ ছ'দিন যেতে হবে—আর একদিন প্লে। প্রথম দিনটা আমার সঙ্গেই যেও। আর একটা কথা বলে দি, রিহার্সালের সময়টা কিন্তু ঠিক রাখবে। যারা বে টাইমে আসে তাদের বড্ড বদনাম হয়ে যায়!

তাপসী শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, রিহার্সালে কতক্ষণ থাকতে হবে?

—সাড়ে সাতটা, আটটা? পারবে তো? আগে থেকে ভেবে নাও—শেষকালটায় আমার যেন বদনাম করো না!

তাপসী মনে মনে হিসেব করল, আটটা পর্যন্ত যদি রিহার্সাল হয়, তা হলে তার বাড়ি ফিরতে অন্তত সাড়ে নটা বাজবে। বাড়িতে চিন্তা করবে সবাই। এত রাত করে সে কখনো ফেরে না। দিদি বাড়ি ফেরার পর তার বাড়ি ফেরার তো কোনো কথাই ওঠেনা। তবু একটা যাহোক·

মিথ্যে কোনো অজুহাত বানিয়ে বলতেই হবে। ঐটুকু ছেলে রঞ্জু, সে যদি যখন তখন বাড়ির বাইরে থাকতে পারে, তাহলে তার এইটুকু স্বাধীনতাও থাকবে না!

মনটা দৃঢ় করে তাপসী বলল, হ্যাঁ পারব। আপনার বদনাম হবে না। আপনি এত সাহায্য করছেন।

মল্লিকা দুখিলি পান একসঙ্গে মুখে পুরে তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আমার তো ভাই কোনো স্বার্থ নেই। তোমার যদি কিছু রোজগার হয়, আমার তাতে ক্ষতিও নেই কিছু। মোটা হয়ে গেছি, এই মাসী পিসীর পার্ট ছাড়া আর কিছু দেয় না—কাজেই তুমি আমার জায়গাও কেড়ে নিচ্ছ না। তবে, টাকাটা পেয়ে একদিন কালীঘাটে পুজো দিয়ে এস। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কোন কিছুতেই উন্নতি হয় না। দ্যাখো যদি পার্ট ভাল করতে পারো, লোকজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতো পারো, তাহলে আরও অনেক জায়গা থেকে কল পাবে। দুএকটা মেয়ে তো এর থেকে সিনেমা-তেও চান্স পেয়ে যায়! তোমার বাড়ির লোকদের কোন আপত্তি নেই তো?

তাপসী বিনা দ্বিধায় বলল, না।

মল্লিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল তাপসীর বাড়িতে কে কে আছে। সব শুনে বলল, আহা, বড় মুশকিল তো তোমাদের। বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ না থাকলে—তোমার দিদি একা কত চালাবে? তারও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে। তোমার পড়াশুনোর খরচই বা চালাবে কি করে? দ্যাখো, যদি পার্টটা অন্তত করতে পারো—

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তাপসী বলল, মল্লিকাদি, আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব! কিছু মনে করবেন না?

—না, না, কি? বলো না?

—এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই তো?

মল্লিকা সস্নেহে তাকালো তাপসীর দিকে। আহা বড্ড মায়া হয় এই সব মেয়েদের জন্যে। প্রত্যেক মেয়েই প্রথম যখন আসে, এরকম ভয় পায়। তারপর দেখতে দেখতে কী রকম চালু হয়ে যায় তারা। এক একজন তো ডাকিনী যোগিনীদেরও লজ্জা দেয়। তখন আর মল্লিকাকে গ্রাহ্যও করে না তারা!

মল্লিকা বলে, শোন, আমি ভাই সাফসুফ সোজা কথা বলতে ভালবাসি! মনের মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকলে এ লাইনে এস না। বাড়ির লোকের আপত্তি থাকলেও আসবার দরকার নেই—তাতে অনেক ঝামেলা হয়। আমি তোমাকে জোর করেও আনছি না। এখনো যদি বলো তো, আমি তোমাকে হাওড়া স্টেশনে পেঁছে দিয়ে আসব।

—না, না, আমি সে কথা বলছি না—

—সেটা বুঝে দেখ নিজে। তবে, তুমি ছেলেমানুষ, সব কিছু বোঝার বয়েসও তোমার হয় নি। খারাপ কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করছ তো? খারাপ ভাল সব তোমার নিজের ওপর। তুমি যদি ভাল থাকতে চাও, তুমি ভাল থাকবে। আর তুমি খারাপ হতে চাইলে কেউ তোমায় আটকাতে পারবে না। থিয়েটারে পার্ট করবে, কাজ চুকলে টাকা নিয়ে তোমার বাড়ি চলে যাবে—এর মধ্যে খারাপ কিছু থাকতে পারে? তুমিই বলো!

—তা তো বটেই!

—এবার বুঝলে আমার কথাটা?

—হ্যাঁ বুঝেছি। মানে···

—অত সহজও নয়। ওখানেই সব শেষ হয় না। ব্যাটাছেলেরা পেছন পেছন ঘুর ঘুর করবেই—যতদিন তোমার বয়েস থাকবে। তাদের সঙ্গে তুমি কি রকম ব্যবহার করবে, সেটা তোমার নিজের ওপর। অনেক মেয়ে আবার মন্দা জুটিয়ে এনে আমারই এই ঘরে আসে। আমি দশ টাকা করে ভাড়া নিই। আমি বাপু অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাই না। যার যার ইহকাল পরকাল সে নিজে বুঝে নেবে।

পাপের ইঙ্গিতে তাপসীর বুক কাঁপতে থাকে। একটু একটু অসহায় লাগে। তার এইটুকু জীবনে সে নিজে কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেয়নি। এখনো সে বুঝতে পারছে না, সে কোন সাংঘাতিক ভুল করতে যাচ্ছে কিনা। কে তাকে পরামর্শ দেবে?

সে অনুনয় করে বলল, মল্লিকাদি, আপনাকে একটু সাহায্য করতেই হবে আমাকে। আমাদের বাড়িতে খুব অভাব বলে আমি এসেছি। কিন্তু টাকার জন্যে যদি মান সম্মান নষ্ট হয়—তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন বলুন।

মল্লিকা একগাল হেসে বলল, এখন ও কথা বলছ, ক'দিন বাদে আর আমাকে চিনতেই পারবে না। দেখলাম তো অনেককে!

—না, না, বিশ্বাস করুন!

—ঐ তো বললাম, তুমি যদি ভাল থাকতে চাও, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। আমি তো দেবই না। আবার যদি কোন ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে আমার এখানে আসো, আমি দশ টাকা ভাড়া নিয়ে ঘর ছেড়ে দেব!

—মল্লিকাদি, ও ক-থা বলবেন না। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

—আরে বাপু টাকার জন্যেই তো সব। ধর্ম পথে থেকে টাকা রোজগার করবে না অধর্মের পথে যাবে—সেটা ঠিক করতে হবে নিজেকেই। তোমার অভাব তাই তুমি এসেছ। আমার যদি রেস্ত থাকত, আমি কি আর এই বয়েসে স্টেজে ধেই ধেই করতে যেতুম? তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতুম। কাশীতে যাবার এত ইচ্ছে আমার—ভেবেছিলুম ছেলেটা যদি মানুষ হত—

—আপনার ছেলে আছে? কোথায়?

মল্লিকার গলায় একটু শোকের চিহ্ন ফুটল না। নির্লিপ্তভাবে বলল, ছিল একটা, মরে গেছে। খেয়ে না খেয়ে মানুষ করেছিলাম ছেলেটাকে—তাও সেটা উচ্ছন্নে গেল। চোর ছ্যাঁচোড়দের সঙ্গে মিশে রেলের মাল চুরি করত—পুলিশ তাকে গুলি করে মেরে ফেললে একদিন। দেখতেও পেলুম না একবার। কী করব বলো, সবই কপাল!

মল্লিকার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে প্রশ্নটা তাপসীর ঠোঁটে এসে গিয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধিমতীর মতন চেপে গেল শেষ মুহূর্তে। এসব বিষয়ে কেউ নিজে থেকে না বললে জিজ্ঞেস করতে নেই।

মল্লিকা ও প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলল, তাই যা বলছিলুম, বেশি টাকা রোজগারের লোভ যদি আসে, তখন তুমি কি করবে, তা তুমিই জানো। তোমার বয়েস কম, চেহারাটাও মন্দ না—লোভ দেখাবার লোকের অভাব হবে না। আমায় দোষের ভাগী করো না। এক কাজ করতে পারো, সঙ্গে করে বাড়ির কোনো লোককে আনতে পারো। ধরো, তোমার মাকে কিংবা ছোট ভাইকে। অনেকে আনে।

মা কিংবা রঞ্জুকে সঙ্গে করে তার থিয়েটারের রিহার্সালে আসার প্রস্তাবটা এমনই অসম্ভব যে তাপসী সেটার জন্য মনের মধ্যে জায়গাই দিল না। জোর দিয়ে বলল, তার দরকার হবে না।

—তা হলে আর একটা কথা বলি। পুরুষ মানুষকে কখনও বিশ্বাস করবে না। অনেক অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে, কিছু বিশ্বাস করবে না। সব হ্যাংলা! হ্যাংলার জাত যাকে বলে! ওরা সবাই এক। তোমার কখনও কপাল পুড়েছে?

তাপসী বুঝতে না পেরে বলল, অ্যাঁ?

—কপাল পোড়ে নি কখনো? বিয়ে হয়নি তো বুঝতে পারছি, কারুর পাল্লায় কখনো পড় নি?

তাপসী ভয়ে ভয়ে বলল, মল্লিকাদি, আমি কখনও বাড়ি থেকে একলা একলা বেরোই না। এই প্রথম বলতে গেলে—

—ঠিক আছে। নিজেকে একটু সামলে-সুমলে রেখ। পুরুষ জাতটাকে কখনও বিশ্বাস করো না।

সিঁড়ি দিয়ে দুজন লোক উঠে এসেছে। পায়ের শব্দ পেয়ে মল্লিকা বেরিয়ে গেল। তারপর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। লোক দুটির বয়েস তিরিসের কাছাকাছি। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা উঠে এসে হাঁপিয়ে গিয়ে মুখ মুছছে রুমালে।

যে-পুরুষ জাতকে এতক্ষণ সাংঘাতিক নিন্দে করছিল মল্লিকা, সেই জাতেরই দুজন প্রতিনিধি উপস্থিত হওয়ায় মল্লিকাকে অত্যন্ত বিনীত ও গদগদ দেখা গেল। চেয়ার থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝেড়ে মল্লিকা বলল, বসুন, বসুন!

লোক দুটি লাজুক ধরনের। আড়চোখে দেখছে তাপসীকে। তাপসীর শরীর আড়ষ্ট হয়ে আসছে, যদিও বুঝতে পারছে যে এই সময়েই তার বেশ সপ্রতিভ ভাব দেখানো উচিত। লোক দুটি আসলে তার ইণ্টারভিউ নিতে এসেছে।

মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, আপনারা চা খাবেন?

লোক দুটি সমস্বরে বলে উঠল, না, না!

—তা হলে কাজের কথা সেরে নিন। এই যে এই মেয়েটির কথা বলেছিলুম আপনাদের। বেশ ভাল অভিনয় করে—

অপেক্ষাকৃত ভারিক্কী চেহারার লোকটি তাপসীকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আগে অভিনয় করেছেন?

তাপসীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার দিকে চোখের ইশারা

করে মল্লিকা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে কয়েক জায়গায় করেছে। রঙমহল বোর্ডেও নেমেছে—গানও জানে ভাল—

—বাঃ তা হলে তো ঠিকই আছে। আমাদের অবশ্য পার্টটা খুব বড় নয়।

মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, তা ও আপনারা একবার দেখে নেবেন না?

—না, না ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন?

ভারিক্কী লোকটি মল্লিকার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, টাকা পয়সার কথা বলেছেন?

—আপনারাই বলে নিন না। সামনা-সামনি কথা বলে নেওয়াই তো ভাল।

—আমরা তো আশি টাকা দেব ঠিক করেছি। আপনার যদি এতে আপত্তি না থাকে—

কথাটা তাপসীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল, কিন্তু তাপসী কিছু উত্তর দেবার আগেই মল্লিকা ঝাঁঝালো ভাবে বলে উঠল, আশি টাকা? বাঃ বাঃ! আপনারা বেশ লোক তো!

লোক দুটি হকচকিয়ে গেল। এবার রোগা লোকটি বলল, কম বলেছি কি? আপনাকেও তো আশি টাকা—

মল্লিকা রীতিমতন রাগের সঙ্গে বলল, সেই কথাই তো বলছি! আমি এ লাইনে পনেরো বছর আছি, আমার রেট হল গে আশি টাকা! আর ও নতুন এসেই আশি পাবে? কেন, ওর বয়সটা কম বলে বুঝি?

লোক দুটি কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল। এক ঝলক দেখে নিল তাপসীর মুখের দিকে। তাপসী এখনো মুখ নিচু করে আছে। টাকা পয়সার কথা শুনতে তার খুব লজ্জা করছে! এটা যদি ওরা আড়ালে সেরে নিত!

ভারিক্কী লোকটা বলল, তা অবশ্য ঠিক। আপনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। ওনার রেটটা একটু বেশি বলে ফেলেছি। ওনাকে আমরা ষাট টাকা দেব—রিহার্সালের খরচা-টরচা সবশুদ্দু আশি টাকা হবে। আপনার রিহার্সালের খরচা আলাদা।

মল্লিকা রীতিমতন জ্বলে উঠল। ভুরু কুঁচকে বলল, কেন? ওরটা কমাবেন কেন? আমারটা বাড়াতে পারেন না? আপনারা কি নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচা করছেন? কেলাবের পয়সা, আপনাদের কি?

—বাঃ, মিটিং-এ আমাদের হিসেব দিতে হবে না ?

—হিসেব দিতে কি বারণ করেছি ! আমরা কি বেহিসেবী টাকা চাইছি ? আমি এত কষ্ট করলাম—

শেষ পর্যন্ত রফা হল, মল্লিকা পাবে একশো টাকা। আর তাপসী পাবে পঁচাশি। কখন রেগে কখন হেসে মল্লিকা লোক দুটিকে একবারে জব্দ করে রাখল। যে-হেতু সত্যিই নিজের টাকা নয়, তাই লোক দুটি দরাদরি করার ব্যাপারে খুব তেজ দেখাতে পারে নি।

কথাবার্তা শেষ হবার পর তাপসীকে পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দেওয়া হল। ঘামে ভেজা কাঁপা হাতে তাপসী নিল টাকাটা। তার জীবনের প্রথম উপার্জন। দিদি চাকরি পেয়ে প্রথম যেদিন টাকা আনে বাড়ীতে, সেদিন পাঁচ টাকার মিষ্টি কেনা হয়েছিল, একটা আস্ত ইলিশ মাছ এসেছিল বাজার থেকে। তাপসী তার রোজগারের টাকা বাড়িতে কি বলে দেবে ? কোন আনন্দের উৎসব হবে না তার উপার্জন উপলক্ষ্যে। তাকে চোরের মতন লুকিয়ে রাখতে হবে।

চার

রেললাইন ধরে হাঁটছিল ওরা তিন চারজন। রঞ্জুর পায়ে এখনও বেশ ব্যথা, হাঁটতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। গায়ে একটু একটু জ্বর, মুখের ভেতরে বিশ্রী স্বাদ। হাঁটার অসুবিধের জন্যে সে কাঠের শ্লিপারগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে।

একজন লম্বা লোক বলল, রঞ্জু, তোমাকে আর আসতে হবে না। তুমি ফিরে যাও বরং!

রঞ্জু জেদের সঙ্গে বলল, না, আমি যাবই।

—তোমার পায়ে ব্যথা, তুমি তো হাঁটতে পারছ না।

—আমি ঠিক আছি। হাঁটতে তো কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

লম্বা লোকটা দৃঢ় ভাবে বলল, না রঞ্জু, আমি বলছি তোমার যাবার দরকার নেই।

রঞ্জু সারা মুখ কুঁচকে বলল, কেন দীপকদা আমাকে বারণ করছেন?

—তোমাকে আমাদের পরে দরকার লাগবে। এখন খোঁড়া পা নিয়ে যাবার দরকার নেই। বাবলু কাল ধরা পড়ে গেল।

—বাবলু ধরা পড়ল নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্য। আমরা ইস্কুলটায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। কোন ছেলে কিছু বলেনি। হেড স্যারটা এগিয়ে এসেছিল, বড় চাকুটা দেখাতেই সটকে পড়ল। কাগজ-পত্তর সব পুড়িয়ে দিয়ে আমরা ঠিকঠাক চলে আসছিলাম—বাবলুটা ফিরে গেল হেডস্যারকে কড়কে দেবার জন্য। তখন পুলিশ এসে গেল—

—তোমাকে কেউ চিনতে পারেনি?

—চিনতে পারলেও আমার বয়ে গেল।

—তোমাকে সেই জন্যেই তো বলছি কটা দিন একটু সাবধানে থাকতে।

—সাবধানে আর কোথায় থাকব? বাড়িতে থাকলে ঠিক পুলিশ আসবে।

—তোমার কোন আত্মীয় টাত্মীয়র বাড়ি নেই অন্য কোথাও! সেখানে চলে যাও, ক'দিন থেকে এস—

—আমাদের সে রকম কোন জায়গা নেই। গরিবকে কেউ পোঁছে না।

—তুমি সকালে বাড়ির কারুকে না বলে চলে এসেছ—

—আমার মেজদির সঙ্গে তো দেখা হল, ও খবর দেবে। দীপকদা, আপনি আমার এসব ব্যাপার নিয়ে ভাববেন না! ওঃ বাবলুকে কি মার মারল! আমি যদি তার বদলা না নিই, তো আমার নাম নেই! সব ভেঙে উড়িয়ে দেব! এ শালার সমাজটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে না দিলে—

দীপকদা হাসলেন। কাছে এগিয়ে এসে রঞ্জুর পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন, চল তোমার পায়ে আগে একটা ব্যান্ডেজ করে দিই। আমার বাড়িতে চল—এই সময় স্ট্রেন করলে ব্যথা আরও বেড়ে যাবে। তুমি একটু ফিট হয়ে নাও—তোমার ওপরে একটা খুব বড় কাজের ভার দেব।

এবার দলের আর একজন দীপককে বললে, তুই রঞ্জুকে স্পেয়ার কর! ও মায়ের এক ছেলে—ওর মা ওকে এত ভালবাসে—

দীপক মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, যা, যা, চুপ মার তো? কত মায়ের

এক ছেলেকে পুলিশ পিটিয়ে মারছে। জেলের মধ্যে মারছে। তবু ও যদি একটা ভাল কাজ করে যায়—ওর জীবনটা ধন্য হবে। সব মা ই তার ছেলেকে ভালবাসে···এক ছেলেই হোক আর পাঁচ ছেলেই হোক! ওসব ছেদো সেণ্টিমেণ্ট—

—কিন্তু ঐটুকু একটা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে অ্যাকসান করিয়ে কি হবে? ও কি কিছু বোঝে? লেখাপড়া করেনি কোনদিন. পার্টি লাইন বোঝে না—খালি জানে ভাঙতে আর পোড়াতে—

রঞ্জু যে ছেলেমানুষ নয়, এটা প্রমাণ করার জন্য সে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে ফসফস করে টানতে লাগল। দীপক কঠোর ভাবে তার সঙ্গীকে বলল. এসব কথা আলোচনা করার জায়গা এটা নয়। ভবিষ্যতে আমি এধরনের কথা শুনতে চাই না। ও লেখাপড়া শেখেনি তো কি হয়েছে। এই সিস্টেমে লেখাপড়া শিখেই বা কি দিগগজ হত—! ও ত গুণ্ডামি বখামি করা শুরু করেছিল—আস্তে আস্তে অ্যাণ্টিসোশ্যাল হয়ে যেত। ওকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি—ভাল ওয়ার্কার—

রঞ্জু বলল, দীপকদা, আমরা কি এইখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করব, না এগুবো? এক্ষুনি ট্রেন আসবে—

পাঁচ

অফিস ক্যাণ্টিনটা ছোট। একপ্লেট আলুর দম আর দু পিস পাউরুটি নিয়ে মানসী সেখানে বসেছে। বাচ্চা বেয়ারাটা এসে বারবার জিজ্ঞেস করছে, দিদি দুধ খাবেন? ভাল দুধ আছে। এনে দিই এক গেলাস দুধ?

মানসী হেসে বলল, নারে লাগবে না! আমার পেট ভর্তি—

—চা-ও খাবেন না?

—না, আমার আর কিছু লাগবে না। তুই যাতো।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, মানসী তাকে আবার ডেকে বলল, এই শোন!

ছেলেটি কাছে আসতে মানসী ব্যাগ খুলে দশটা পয়সা বার করে তার

হাতে দিয়ে বলল, এটা তুই নে। আমাকে এক গেলাস জল দিয়ে যাস তো!

বাচ্চা ছেলেটাকে মানসীর খুব ভাল লাগে। মাত্র পঁয়তিরিশ টাকা মাইনে পায়—কিন্তু সব সময় বেশ হাসিখুশি থাকে। ছেলেটির সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করে মানসী। ওর বাবার টি. বি. হয়েছে, ওরা দুভাই বোন, রোজগার করার আর কেউ নেই। কি করে ওদের সংসার চলে কে জানে? তবু ছেলেটি এরকম হাসিখুশি থাকতে পারে কি করে?

এক গেলাস দুধের দাম এই ক্যান্টিনে সত্তর পয়সা। অত পয়সা খরচ করার বিলাসিতা মানসীর নেই। টিফিনে সে চল্লিশ পয়সার বেশি খরচ করে না—সব সময় তাকে পয়সা হিসেব করতে হয়। এক এক সময় মনে হয়, টিফিনের পয়সাটাও বাঁচাতে পারলে মন্দ হত না—মাসে অনেকগুলো টাকা বেঁচে যেত। অফিসে সম্মান রাখার জন্যই টিফিন খেতে হয়।

মানসীদের অফিসে সব মিলিয়ে ছটি মেয়ে কাজ করে। এই সব মেয়ে মিলে এক সঙ্গে টিফিনে বসাই প্রথা। কিন্তু অফিসের মেয়েরা তাকে এড়িয়ে চলে, হিংসে করে তাকে। অফিসের মেয়েদের মধ্যে মানসীই সবচেয়ে সুন্দরী। মানসী অবশ্য খুব একটা রূপসী না, তার গায়ের রং ফর্সা, স্বাস্থ্যটা মন্দ নয়—অফিসের অন্য মেয়েদের সেটুকুও নেই। অন্য মেয়েরা তাকে এড়িয়ে চলায় মানসী অবশ্য খুশিই। সে পারতপক্ষে কারুর সঙ্গে বেশি কথা বলেনা। অন্য মেয়েরা একটু আলাদা হলেই শুধু পরনিন্দা আর পরচর্চা, কোন্ ছেলে তার দিকে তাকালো, কে কাকে দেখে হেসেছে,—এই সব আলোচনা। জ্যোৎস্না নামে একটি মেয়ে এত অসভ্য কথা বলে যে—কোন মেয়ের মুখ থেকে এরকম কথা বেরুতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।

একমাত্র গীতা নামের একটি মেয়েই মানসীর সঙ্গে মেশে। গীতাকে খুবই খারাপ দেখতে—শুকনো চেহারা, রঙটা পোড়া পোড়া—অথচ মেয়েটার মনটা সত্যিই ভাল। কখনো কারুর নিন্দে করে না। বিয়ে হয়ে গেছে গীতার—স্বামীটা অমানুষ, তবু গীতাকে তা নিয়ে কখনো প্যান প্যান করতে শোনা যায় নি। আজ গীতাও আসেনি অফিসে। মানসী বসেছিল একা।

অনেকক্ষণ থেকেই মানসী লক্ষ্য করছে যে একটা দূরের টেবিলে বসে অমল তাকিয়ে আছে তার দিকে। আজ সারাক্ষণ ধরেই সে অনুভব করছে অমলের দৃষ্টি। কথা বলার জন্য ছটফট করছে। মানসীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ছেলেগুলো বোঝে না কেন? এরা কি ভাবে সব মেয়েই প্রেম করার জন্য মুখিয়ে আছে? মানসীর ওসব কথা ভাববার সময় নেই। ছেলেগুলো তাকে ভাবে অহংকারী। ভাবুক্! কিন্তু ছেলেগুলোকে চটাতে সাহস হয় না। ওরা সে-রকম ভাবে পেছনে লাগলে একটা মেয়ের অফিসে চাকরি করা অসম্ভব করে তুলতে পারে। কিছুদিন আগে সুষমা বলে একটি মেয়ে চাকরি করত এখানে—বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিল। তার বিয়ে ঠিক হওয়ার পর মানসী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি বিয়ের পর আর চাকরি করবে না? সুষমা বলেছিল, আবার চাকরি! চাকরির ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার! নিতান্ত নিরুপায় না হলে কোনো মেয়ে এ জায়গায় চাকরি করতে আসে? সুষমা নিষ্ঠুরের মতন কথাটা বলেছিল মানসীর সামনে। সে কি জানত না—মানসীই সবচেয়ে নিরুপায়।

মানসী জল খেয়ে উঠতে যাচ্ছিল, অমল উঠে এসে দাঁড়ালো তার টেবিলের সামনে। বলল, কাল আপনি বলেছিলেন আপনার নাম ধরে ডাকতে। সুতরাং আপনাকে আমি মানসী বলে ডাকতে পারি?

মানসী উত্তর দিল না।

অমল আবার জিজ্ঞেস করল, কি পারি?

মানসী এবার বলল, হ্যাঁ পারেন। কিন্তু আমার সঙ্গে বিশেষ কোনো দরকার আছে কি?

—হ্যাঁ আছে। আপনি এ মাসের ইউনিয়ানের চাঁদা দেন নি। এখন ছাড়ুন তো। দু টাকা।

মানসীর ব্যাগে আর দু টাকাই মাত্র আছে। মাসের শেষ। ঝট করে দু টাকা খরচ করা এখন তার পক্ষে শক্ত। তা ছাড়া আজ আর সঙ্গে কিছু থাকবে না। কিন্তু অমলকে টাকাটা দিয়ে বিদায় করতেই পারলেই ভাল হত।

মানসী মুখ তুলে বলন, মাসের শেষে চাঁদার কথা মনে পড়ল? মাসের প্রথমে বলতে পারেন না?

—মাইনের দিন টাকাটা পেয়েই আপনি সুট করে কোথায় যে কেটে পড়েন ! আপনার পাত্তাই পাওয়া যায় না !

—কিন্তু তার পরের দিন ? বা দু একদিনের মধ্যে ?

—চাঁদাটা আপনাকে নিজে থেকেই দিয়ে দেওয়া উচিত। এতে জোর জুলুম তো কিছু নেই।

—আমি যদি আজ দিতে না পারি ?

অমল একগাল হেসে বলল, সামনের মাসে দিয়ে দেবেন। বললাম তো, জোর জুলুম কিছু নেই।

—আচ্ছা, ধন্যবাদ !

—শুনুন, উঠলেন এর মধ্যেই। এক কাপ চা খাবেন আমার সঙ্গে ?

—না, আমি এবার উঠব।

—এক কাপ চা আমার সঙ্গে বসে খেলে আপনার জাত যাবে না। এই খোকা, দুটো চা দিয়ে যা তো ! খুব জলদি।

অমল ধপ করে বসে পড়ে আরাম করে সিগারেট ধরাল ! তার মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যায়, সে জোর করে অতিরিক্ত স্মার্ট হবার চেষ্টা করছে। ক্যানটিনে অফিসের মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের একসঙ্গে বসে খাওয়ার কোনো প্রথা নেই এখানে। কোনো আইন-কানুন বা বিধি-বিষেধ নেই সে রকম, কিন্তু এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অমল জোর করে ভাঙতে চাইছে সেটা। অন্যরা যে চোরা চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে, তার জন্য ভ্রুক্ষেপ নেই অমলের। মানসী একটু অবাক না হয়ে পারল না।

অমল টেবিলের ওপর এক হাতের কনুইয়ের ভর দিয়ে তালুতে থুতনি রেখে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, কাল আমি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে আপনার সঙ্গে যায়নি। কিন্তু আজ আমি নিজেই নিজেই কাছে একটা বাজি ফেলেছি। যাকগে, কালকে আমাকে স্টেশনে ফেলে হঠাৎ ও রকম ভাবে চলে গেলেন কেন ?

—বাঃ, আপনি তো বললেন, কলেজের কাছে যাবেন, আমার বাড়ি অন্য দিকে।

—চুঁচড়োয় আমার কোন কাজ ছিল না। আমি আপনার সঙ্গে যাব

বলেই গিয়েছিলাম। আপনি হঠাৎ আমাকে ফেলে চলে গেলেন? একটু আমার সঙ্গে কথা বললে কোন ক্ষতি ছিল?

—স্টেশনে দাঁড়িয়ে আপানার সঙ্গে কি কথা বলব?

—আপনি ভয় পাচ্ছিলেন কেউ দেখে ফেলবে বলে? এটা টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর সেকেন্ড হাফ—এখনও একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ে কথা বললে—

—আমার কাজ ছিল!

আপনার বাড়িতে আমাকে যেতে বলতেও তো পারতেন। যাকগে, আমি নিজের কাছে কি বাজি ফেলেছি জানেন? আমি আপনার সঙ্গে ভাব করবই করব।

—আপনার সঙ্গে তো আমার ঝগড়া নেই?

—সে কথা বলছি না! আমি জানতে চাই, আপনার রহস্যটা কি! আপনি কারো সঙ্গে মেশেন না, কথা বলেন না—

মানসী হাসল জোর করে, ক্লিষ্ট হাসি। সব ছেলেরাই বুঝি মেয়েদের মধ্যে রহস্য খোঁজে। তার মতন সাদা মাটা একটি মেয়েকে কেউ রহস্যময়ী ভাবছে—একথা শুনলে হাসি পাওয়ারই কথা। বলল, আমার কোন রহস্যই নেই। আমি একটা নেহাৎ সাধারণ মেয়ে—

—সাধারণ কি অসাধারণ সেটা আমি বুঝব! আপনি নিজেকে সবার কাছ থেকে এ রকম দূরে সরিয়ে রাখেন কেন?

মানসী একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল, তার ছোট ভাই রঞ্জু সকালবেলা অসুস্থ শরীর নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে। মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে মানসী। মায়ের নিশ্চয় সারাদিন মন খারাপ।

মানসী অমলকে অনুনয় করে বলল, আপনি আমার সম্বন্ধেই এমন মনোযোগী হয়ে উঠলেন কেন? অফিসে আরও তো মেয়ে আছে—

—তার কারণ, মানসী, আপনাকে আমার ভাল লাগে—

কথাটা বলেই অমল লজ্জা পেয়ে গেল। মুখখানা লালচে। যদিও সে মানসীর চেয়ে বছর চারেকের বড়, কিন্তু এখন তাকে দেখাচ্ছে ছেলে-মানুষের মতন। যেন কোন একটি বাচ্চা ছেলে বড়দের সামনে দুষ্টমী করে ধরা পড়া গেছে। মানসীর সামান্য হাসি এসে গিয়েছিল, তবু জোর করে গম্ভীর হয়ে রইল।

অমলের সপ্রতিভ ভাব একদম চলে গেছে. রীতিমতন নার্ভাস হয়ে আন্তরিক ভাবে বলল, আপনি হয়তো আমাকে খারাপ ভাবছেন, কিন্তু আমার সঙ্গে একটু মিশলেই বুঝতে পারবেন, আমার কোনো খারাপ মতলব নেই।

চেয়ারছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মানসী নির্লিপ্ত ভাবে বলল, আমি তো আপনাকে খারাপ ভাবি নি। কিন্তু এবার আমাকে কাজ করতে যেতেই হবে।

অমল মিনতি করে বললো. একটু দাঁড়ান, এমন কিছু দেরী হয়নি।

মানসী বললো, অমলবাবু। এইসব ভালো লাগা না-লাগার ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সময় আমার নেই।

মানসী সোজা চলে গেল নিজের কাজের টেবিলে। জীবনে প্রথম কোন একটি মেয়ে সামনাসামনি বসে ভাল-লাগার কথা বলার পর অমল এতই নার্ভাস হয়ে গেছে যে তক্ষুণি সে কাজে ফিয়ে যেতে পারল না। তাকে বাথরুমে ছুটতে হল।

মানসী কাজ করতে বসে কোন দিকে তাকায় না—কারুর সঙ্গে কথা বলে না। কাজের ব্যাপারে তার সুনাম আছে। এবং অফিসে কারুর কাজের সুনাম থাকলে যা হয়, তার ঘাড়েই বেশি কাজ পড়ে। মানসী তবু কোন আপত্তি করে না। কাজের ব্যাপারে তার ক্লান্তি নেই। মানসী একদিনও ছুটি নেয় না পারতপক্ষে। দু তিন বছরের মধ্যে তার কোন অসুখ করে নি, ছোটখাটো শরীর খারাপ হলে কারুকে সে জানতেও দেয় না। ছুটি না নিলে কাজের সুনাম হয়. তা ছাড়া বছরের বেশি ক্যাজুয়েল লীভ জমা থাকলে তার জন্য অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায়। এই চাকরিই এখন তার জীবন সর্বস্ব—এর জন্যে মানসী সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

তবু মুখে যতই নির্লিপ্তভাব দেখাক আজ মানসীর বুকের ভেতরটা দুপদুপ করছে। মনটা বারবার চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে। কোন পুরুষ মানুষ মুখের সামনে ভাল-লাগার কথা বললে কোন মেয়ে সেটা উড়িয়ে দিতে পারে না। না অমলকে বেশ ছেলেমানুষ মনে হয়। কিন্তু এখন মানসীর চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে অন্য একটি মুখ।

শুধু ভাল-লাগার কথা নয়. ভালবাসার কথা এর আগে কয়েকবার শুনেছে মানসী। রংটা যদি ফর্সা হয় আর স্বাস্থ্যটা যদি একটু ভাল

থাকে—তাহলে মেয়েদের এ-রকম শুনতেই হয়। মানসী কখনো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে নিজেকে ধরা দেয়নি। তবে, যৌবনের প্রথম শুরুতে মানসী নিজেই একজন পুরুষকে ভালবাসার কথা বলেছিল। ভুল হয়েছিল সে রকম বলা। কিন্তু এখন সেই মানুষটার কথাই বেশি মনে পড়ছে মানসীর।

কোনদিন যা করে না, সেদিন অফিস থেকে আগে আগে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে গেল মানসী। তিনটের সময় বড়বাবুর কাছে ছুটি চাইতে গেলে তিনি এমনই অবাক হয়ে গেলেন যে কি করবেন, বুঝতেই পারলেন না। ব্যস্ত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়! আপনার খারাপ লাগছে? বাড়িতে কিছু হয়েছে?

মানসী স্পষ্ট ভাবে বলল, না, সে-রকম কিছু নয়।

বেরুতে গেলে অমলের টেবিলের সামনে দিয়েই আসতে হয়। বিস্মিত অমলের চোখের সামনে দিয়ে মুখ উঁচু করে হেঁটে বেরিয়ে গেল মানসী। অফিসের বাইরে এসে হাওড়ার ট্রামের বদলে ভবানীপুরের দিকে বাসে উঠে পড়ল।

ভবানীপুরের একটা বাড়িতে দোতলার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মানসীর বুক কাঁপছে। অনেকদিন সে এরকম দুর্বল হয়ে পড়ে নি।

দরজার বেল বাজার পর দরজা খুললেন এক মহিলা। মানসী ক্ষীণ ভাবে হেসে জিজ্ঞেস করল, বৌদি, হিরন্ময়দা আছেন?

মহিলা বললেন, হ্যাঁ, আছে। এস। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি—

হিরন্ময় বসে বসে একটা তানপুরা মেরামত করছিল। মানসীকে দেখে বলল, কি রে, তুই হঠাৎ কোত্থেকে এলি? অফিস টফিস নেই।

মানসী হেসে বলল, আজ অফিস পালিয়েছি!

সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসিটুকু ফিরিয়ে নিয়ে বলল, হিরন্ময়দা দুপুরবেলা এসে তোমাদের বিরক্ত করলুম না তো?

হিরন্ময় বলল, বিরক্ত? আরে, আমাদের বিয়ে হয়েছে বারো বছর! এখন কি আর দুপুরবেলা কেউ এলে বিরক্ত হবার বয়েস আছে? কি বলো নীতা।

নীতা স্বামীর দিকে ভ্রূভঙ্গী করে মানসীকে বলল, বসো, পাখার তলায় বসো। রোদ্দুরে এসেছ, ঘেমে গেছ একেবারে!

হিরন্ময় বলল, কি খবর-টবর বল ! অনেকদিন আসিস নি কেন ?

মানসী বলল, তোমরাও চুঁচড়োয় যাও না।

—আর যাওয়া হয় না। এখন প্রত্যেকদিন সকালে আর সন্ধ্যেবেলায় গানের ক্লাস নিই। একদম সময় পাই না—

—এখন কত ছাত্রাছাত্রী তোমার ?

—তা এবার বেশ ভালই হয়েছে। সব মিলিয়ে জনা তিরিশেক হবে। তুই গান একেবারে ছেড়ে দিলি ?

মানসী দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে বলল, আমার আর গান। সবাইকে দিয়ে কি আর সব কিছু হয়।

নীতা বলল, কেন, মানসী তোমার গানের গলা তো বেশ ভালই ছিল। তুমি ছেড়ে দিলে কেন ? সন্ধ্যেবেলার ক্লাশটাতে তুমি তো আবার শিখতে পার। অফিসের পর চলে আসবে। অফিসে চাকরি করা অনেক ছেলে মেয়ে আসে।

—না বৌদি, আমার সময় হবে না।

হিরন্ময় বলল, ওরে বাবা, মানসী আজকাল ভীষণ ব্যস্ত মানুষ হয়ে গেছে দেখছি। সন্ধ্যেবেলায় ওর সময় হবে না ? সন্ধ্যেবেলা কি করিস? প্রেম-ট্রেম করছিস নাকি ?

মানসী কোন উত্তর দিল না। নীতা বলল, তা যদি করে, অস্বাভাবিক কিছু না। এই তো বয়েস, এখন যদি ওসব না করে, আবার কবে করবে?

হিরন্ময় তানপুরায় তাঁর বেঁধে টুং টাং আওয়াজ করতে লাগল। তারপর মানসীকে বলল, সা-পা ধরতো সুরটা মিলিয়ে নিই।

মানসী বলল, আমি পারব না আমার গলা দিয়ে সুর বেরোবে না।

—তা হলে এতকাল শেখালুম কি তোকে ?

—সব ভুলে গেছি।

—তুই কোন কর্মের না।

ঠিকে ঝি এসে দরজা খটখট করছে। নীতা দরজা খুলে দিতে গেল। ফিরে এসে বলল, মানসী, চা খাবে ? না একটু সরবৎ বানিয়ে দি ?

—না, বৌদি, ওসব কিছু লাগবে না। আপনি বসুন তো !

—আহা, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন ? আমরা তো এই সময় চা-টা খেতামই।

হিরন্ময় বলল, মানসী আজকাল খুব ফর্মাল হয়ে গেছে। খুব পর পর ব্যবহার করে আমাদের সঙ্গে। তোর বাড়ির সবার খবর কি রে? তোর মা কেমন আছেন? আর তোর সব ভাইবোনেরা?

মানসী সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, ভাল।

নীতা বলল, বসো। আমি চায়ের জল চাপিয়ে আসি।

নীতা রান্নাঘরে চলে যাবার পর হিরণ্ময় এক মনে তানপুরাটার আওয়াজ সুরে আনার চেষ্টা করছে, মানসী চুপ করে বসে দেখছে। হিরণ্ময় মুখ না তুলেই বলল, হঠাৎ এতদিন বাদে দুপুরবেলা চলে এলি যে? কিছু দরকার ছিল?

—না।

—আমাকে কিছু বলবি?

—না।

—তাহলে?

—এমনিই আসতে পারি না?

—তা পারিস। কিন্তু আসিস না তো। হঠাৎ আজ?

—তোমাকে দেখতে এলাম।

হিরণ্ময় এবার মুখ তুলল। একদৃষ্টে দু'এক মিনিট তাকিয়ে রইল মানসীর মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তোর সেই পুরোন অসুখটা এখনো আছে দেখছি!

—মাঝে মাঝে জেগে ওঠে।

—ভাল নয়, ভাল নয়। তোর বয়েসে এটা ভাল নয়। বিবাহিত লোকের প্রেমে পড়লে শুধু দুঃখই পেতে হয়।

—দুঃখ তো পাচ্ছি সারা জীবন।

—আমি তোকে কত বার বলেছি। এসব কথা মাথা থেকে মুছে ফ্যাল্।

নীতা ঘরে ফিরে আসতেই মানসী বলল, বৌদি, একটু জল খাব। আচ্ছা তুমি বসো। আমি নিজেই নিয়ে নিচ্ছি।

নীতা তাতে রাজী নয়। সে-ই জল আনতে যাচ্ছিল মানসীর জন্য মানসী তার সঙ্গে চলে গেল রান্নাঘরে। সেখানে দুজনে মেয়েলী গল্প করল কিছুক্ষণ। তার পর দুজনে একসঙ্গে চা নিয়ে ফিরে এল। হিরন্ময়

সামনের মাসে ফ্রিজ কিনছে—ফ্রিজটা কোথায় রাখা হবে—সেই আলোচনায় চলে গেল বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর মানসী জিজ্ঞেস করল, বৌদি সন্ধ্যেবেলার ক্লাশ কটা থেকে আরম্ভ হয়?

—ছ'টা। পৌনে ছ'টা থেকেই সব আসতে শুরু করে।

—আমি তাহলে এবার উঠব।

নীতা বলল, বসো, বসো, এখনো অনেক দেরী আছে। তুমি একটু বসে ওর সঙ্গে গল্প করো, আমি চট্ করে গা-টা ধুয়ে আসি।

নীতা চলে যাবার পর মানসী বলল, নীতা বৌদি খুব ভাল।

হিরণ্ময় বলল হুঁ। আমাকে খুব বিশ্বাস করে। নইলে এতদিনে কোথায় তলিয়ে যেতাম!

—কেন, তলিয়ে যেতে কেন?

—এই তোর মতন সব কাঁচ কাঁচ মেয়েরা যখন প্রেম জানায়, তখন কি সহজে মাথা ঠিক রাখা যায়?

—আরও অনেকে জানিয়েছি বুঝি?

—বছরে অ্যাভারেজে দুটো। গানের মাস্টারকে অনেক মেয়েই হঠাৎ ভালোবেসে ফেলে। শুনে তোর রাগ হচ্ছে?

—না, আমি রাগ করব কেন?

দু'জনেই একটু চুপ। তানপুরাটা তুলে রেখে হিরণ্ময় এবার একটা হারমোনিয়াম নিয়ে বসল। প্যাঁ পোঁ করল বেশ কিছুক্ষণ। সারাদিন সারা সন্ধ্যে হিরণ্ময় গানের জগতেই থাকে। একবার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল তুই আমার রেডিও প্রোগ্রাম শুনিস? পরশুদিন ছিল?

মানসী বলল, সকালেরটা শুনেছিলাম। সন্ধ্যেবেলার প্রোগ্রামটা শুনতে পারিনি। বাড়ি ছিলাম না।

সন্ধ্যেরটা শুনলি না? কি গান গেয়েছিলাম জানিস? সেই গানটা—'দেখ সখা, ভুল করে ভালবেস না?' তোকে শিখিয়েছিলাম এটা!

অকারণেই হো হো করে হেসে উঠল হিরণ্ময়। মানসীর মুখ আরক্ত। হিরণ্ময়ের কাছে এলেই সে যেন ফিরে পায় তার কৈশোর ও

প্রথম যৌবনের দিনগুলো। হিরন্ময় তখন উদীয়মান গায়ক, বাড়িতে গিয়ে গান শেখাতো মানসীকে।

হারমোনিয়ামটা একপাশে ঠেলে রেখে হিরন্ময় সীরিয়াস হয়ে গেল। চোখ দুটি সংকুচিত করে বলল, তোর খবর কি বল ?

—আমার তো কিছু খবর নেই।

—সারাদিন কি করিস ? অফিস যাস, আর বাড়িতে গিয়ে বসে থাকিস ?

—তা ছাড়া আর কি করব ?

—বেশির ভাগ মানুষই এইরকম ভাবে জীবন কাটায়। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানিস ? মানুষের জীবনে আরও কিছু একটা থাকা দরকার। আরও এমন একটা কিছু অবলম্বন থাকা উচিত, যা দিয়ে মানুষ এই সাধারণ স্তর থেকে একটু উঁচুতে উঠতে পারে। সত্যিকারের আনন্দ তার থেকেই পাওয়া যায়। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটায় তো সব নয় !

মানসী হিরন্ময়ের চোখে চোখ রেখে বলল, কিন্তু শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই যদি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ? আগে তো সেটা দরকার ?

—সেটা যত বড় সমস্যাই হোক, সেটাকে প্রধান বলে মনে করা উচিত নয়। দ্যাখ, আমিও এক সময় কম কষ্ট করি নি। তুই তো জানিস, বিয়ে করার পর, কী সাংঘাতিক কষ্ট করে সংসার চালিয়েছি। না খেয়ে খেয়ে আমার প্লুরিসি হয়ে গেল। তবু কি হার স্বীকার করেছি ?

—আমিও তো হার স্বীকার করছি না !

—তবে, আজকাল মুখ চোখ এত শুকনো করে থাকিস কেন ? তোদের সংসারের কথা আমি জানি। তোর বাবা মরে যাবার পর অসুবিধেয় পড়েছিস। কিন্তু তুই ভাবছিস, তোর জন্যই সংসারটা চলছে। খুব একটা আত্মত্যাগ করছিস বাড়ির সকলের জন্য। কিন্তু তুই যদি কোনো কারণে আজ মরে যাস্, তাহলে কি তোদের সংসার চলবে না ? চলবে ঠিকই। কিছুই ভেসে যাবে না। এখনকার চেয়ে খুব একটা ইতর বিশেষও হবে না।

—ঠিকই বলেছো, আমি মরে গেলেও কারুর কিছু যাবে আসবে না।

—ছেলেমানুষী অভিমান ?

—হিরণ্ময়দা, আমাকে বলে দাও তো, আমার কী করা উচিত !

—নিজের জীবনটা নষ্ট করিস না ! আমার সম্পর্কে এখনও তোর খুবই দুর্বলতা আছে ?

—আমি তোমাকে ভুলতে পারি না !

হিরণ্ময় আবার হালকা হয়ে গেল। মুখে দুষ্টুমীর হাসি এনে বলল, তাহলে আর কী করা যাবে ! তুই মুসলমান হতে পারবি ?

—তার মানে ?

—এখন তো দুটো বিয়ে এমনিতে আর আমাকে করতে দেবে না — মুসলমান হয়ে যদি করা যায়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় একটা বউতে আমার ঠিক চলছে না। দুটো বউ-ই দরকার !

—ওরকম বাজে কথা বলো না। নীতা বৌদি যাতে দুঃখ পাবে—সে রকম কাজ কখনো তোমার করা উচিত নয় !

—তাহলে অলটারনেটিভ কি ?

—মনে হচ্ছে, আমি তোমার গলগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছি ?

হিরণ্ময় উঠে কাছে এসে সস্নেহে মানসীর পিঠে একটা হাত রাখল। গাঢ় গলায় বলল, নারে, আমি কখনো সে রকম ভাবি না। তোর জন্য আমার মায়া হয়। কিন্তু তুইতো এখন বাচ্চা মেয়ে নেই, এখন আর এ-রকম পাগলামী করিস না ! তোর বয়েসী কত ছেলে তোকে ভালবাসতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে। যদি কোনদিন দেখি, সেই রকম কোন একটা খাঁটি স্বভাবের ছেলেকে তুই ভালবাসতে পেরেছিস, আমি তাহলে সত্যি খুশি হব।

মানসী নিজেকে সামলাতে পারল না। কেঁদে ফেলল হু হু করে।

হিরণ্ময় বলল, এই, একি করছিস ! কান্নাকাটি করার মতন কী হল এর মধ্যে ? এক্ষুণি নীতা আসবে, তোকে এই অবস্থায় দেখলে কি ভাববে ?

ছয়

—এই হিমানী, এই রোববার আমাদের পিকনিক, মনে আছে তো? কালকের মধ্যে তোর চাঁদাটা দিয়ে দিবি। পাঁচ টাকা চাঁদা।

—আমি তো যাব না!

—যাবি না? কেন? আমাদের ক্লাশের সবাই যাবে!

—না ভাই, আমি যাব না।

—কেন, তোর বাড়ি থেকে যেতে দেবে না? আমরা গিয়ে মাসিমাকে বলে আসব।

—আমার মাকে বলার দরকার নেই। আমার এমনিই যেতে ইচ্ছে করে না!

—যেতে ইচ্ছে করে না? সবাই মিলে ব্যাণ্ডেল চার্চে যাব, সারাদিন ওখানে থাকা হবে—

—আমার যাওয়া হবে না!

—লতিকাদি, লতিকাদি, এই দেখুন, হিমানী বলছে পিকনিকে যাবে না।

লতিকাদি ওদের ক্লাশ টিচার। এত রোগা চেহারা যে উঁচু ক্লাশের মেয়েরা আড়ালে ওঁকে বলে লবঙ্গলতিকা। লতিকার স্বভাব খুব ঠাণ্ডা, কোনদিন ক্লাশের মেয়েদের বকাঝকা করেন না। সেইজন্যই অবশ্য ওঁর ক্লাশে একটু বেশি গোলমাল হয়, হেড মিস্ট্রেস বলেন, ওঁর ক্লাশ ম্যানেজ করার ক্ষমতা নেই।

লতিকা হিমানীকে ডাকলেন। মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন, কি হিমানী, তুমি যাবে না কেন?

অন্য মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। হিমানী মুখ নিচু করে বলল, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না!

—ওমা, যেতে ইচ্ছে করে না আবার কি? আমরা সবাই মিলে যাব। নিজেরাই রান্নাবান্না করব, খুব মজা হবে। তোমার এসব ভাল লাগবে না?

—কোথাও যেতে আমার ভয় করে।

লতিকা বললেন, এই আস্তে! তোমরা সবাই মিলে গোলমাল করো না। তারপর হিমানীর দিকে ফিরে বললেন, তোমার ভয় করে? কেন আনন্দ করবে, ফূর্তি করবে—পিকনিকে কত মজা হয়, এর মধ্যে ভয়ের কি আছে?

হিমানী ম্লান মুখে লতিকার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মাঝে মাঝে খুব পেট ব্যথা করে। তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কোথাও গিয়ে যদি সে রকম পেট ব্যথা হয়—

—পেট ব্যথা? সেটা এমন কিছু নয়। রাত্তির বেলা শোওয়ার আগে একটু মিল্‌ক অফ ম্যাগনেশিয়া খেয়ে নিও। যাক্‌ গে, পেট ব্যথার জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি ভাল ওষুধ নিয়ে যাব। তোমাকে যেতে হবে কিন্তু, বুঝলে? সবাই যাচ্ছে, তুমি একলা না গেলে—

ক্লাশ শেষ হবার পর লতিকাদি আলাদা ডেকে নিয়ে গেল হিমানীকে। ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সত্যিকারের অসুবিধে কি বলত? টাকা দিতে অসুবিধে হবে? টাকাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। আমি বুঝি তো। অনেকের অসুবিধে হয়। শোন হিমানী, তোমার টাকাটা আমি দিয়ে দেব না হয়—

হিমানী বলল, না, না, টাকার জন্য নয়। আমার দিদির কাছে চাইলে টাকা দিয়ে দেবে।

লতিকা বললেন, তা হলে তোমাকে ঠিক যেতে হবে কিন্তু।

মানসী বাড়ি ফিরে বলল, মা, হিমানী কোথায়? মা বললেন, কেন, ও তো ঘরে বসে পড়াশুনো করছে।

—ডাক তাকে।

—কেন, হঠাৎ এসেই হিমানীর খোঁজ করছিস কেন?

মানসী তার বড় হাত ব্যাগ খুলে তিনখানা পুরোন বই বার করল। তারপর বলল, দ্যাখ, তোমার মেয়ের কাণ্ড দ্যাখ!

মা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কি হয়েছে কি? ওগুলো কিসের বই?

—স্টেশনের কাছে সতীশবাবু ডেকে আমাকে এই বইগুলো দিলেন।

তোমার মেয়ে সতীশবাবুর দোকানে এই বইগুলো আজ বিক্রী করে এসেছে। ওর নিজের পড়ার বই। কত কষ্ট করে এই সব বই কিনে দিতে হয়—

—কি সাংঘাতিক কথা। বই বিক্রী করেছে কেন?

—তোমার মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস কর।

হিমানীকে ডাকা হল। বহুদিনের পুরানো একটা ফ্রক পরে আছে। যেটা এক সময় ছিল তাপসীর। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কাঁধের কাছে বেশ ছেঁড়া।

মানসী কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, এই বইগুলো কার? চিনতে পারিস?

হিমানী কোন উত্তর দিল না।

মানসী মায়ের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ভাবে বলল, সারাদিন খেটেখুটে আসবার পর এইসব কারুর ভাল লাগে? লোকজন ডেকে ডেকে যদি এই ধরণের কথা বলে, তাহলে মান সম্মান কোথায় থাকে—সতীশবাবু বাবাকে চিনতেন—

তারপর হিমানীর দিকে তাকিয়ে আবার ধমক দিয়ে বলল, কিরে উত্তর দিচ্ছিস না কেন? বইগুলো কার?

হিমানী তবুও উত্তর দিল না। বিবর্ণ মুখ।

তাপসী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে, হয়েছে কি? কেউ তাপসীর কথায় উত্তর দিল না। মানসী রীতিমতন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, বইগুলো কার?

হিমানী কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল, আমার।

—বিক্রী করেছিস কেন?

—ওগুলো আমার দরকার লাগে না।

—দরকার লাগে না? সবে তিন মাস হল নতুন ক্লাশ আরম্ভ হয়েছে, এর মধ্যেই বইগুলো দরকারে লাগে না? তাহলে এগুলো কেনা হয়েছিল কেন?

—ওগুলো আমার সব পড়া হয়ে গেছে। দরকারী জায়গাগুলো আমি লিখে নিয়েছি।

—পড়া হয়ে গেলেই বই বিক্রী করে দিতে হবে? আমাদের বাড়িতে

কেউ কখন বই বিক্রী করেছে ? তাও স্টেশনের ধারের দোকানে গিয়ে ! তুই নিজে গিয়ে বই বিক্রী করলি তোর একটুও লজ্জা করল না ?

হিমানী আবার চুপ। মা বললেন, ওর তো পড়াশুনোয় মন ছিল। ও এ রকম করে বেড়াবে !

তাপসী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে রে খুকী ? বইগুলো বিক্রী করেছিস কেন ?

হিমানী তবু কোন উত্তর দেয় না।

মানসী আবার বলল, কি করেছিস টাকা দিয়ে ?

একথারও কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

—কি করেছিস টাকা দিয়ে? বল্, শিগগির। আমার মেজাজ ঠিক থাকছে না। তুইও কি তোর দাদার মতন লেখাপড়া টেখাপড়া গোল্লায় দিতে চাস ? তারপর কি ঝি গিরি করবি ? না তুইও বোমা টোমা ছুঁড়তে যাবি ? কি ? বল্ ? উত্তর দে !

হিমানী হঠাৎ কান্না মেশানো তেজের সঙ্গে বলে উঠল, আমি আর কোনদিন ইস্কুলে যাব না। পড়াশোনা করব না, কিছু করব না ! আমি কোথ্থাও যাব না।

মানসী আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। চট করে উঠে এসে হিমানীর গালে বেশ জোরে একটা চড় লাগালো। বলে উঠল, বড় তোর বাড় বেড়েছে, না ? কেউ কিছু বলে না বলে—

মানসী আর একটা থাপ্পড় মারতে যাচ্ছিল, তাপসী মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বলল, এই দিদি, কি হচ্ছে কি ? তোর আজকাল বড্ড মেজাজ হয়েছে !

উদ্যত চড় খানা থামিয়ে নিয়ে মানসী অবাক হয়ে তাকাল মেজ বোনের দিকে। তাপসী তো কখন দিদির মুখের ওপর এরকম ভাবে কথা বলে না !

মানসী অবশ্য আগে কখন ভাইবোনের গায়ে হাত তোলে নি। কিন্তু আজকাল সে আর ধৈর্য রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। মানসী ধমক দিয়ে বলল, তুই সরতো ? একটু শাসন না করলে ও আজকাল বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। রঞ্জুটা তো শাসনের বাইরে চলে গেছে—

তাপসী বলল, শাসন করার আগে ভাল করে জানা উচিত, কেন এরকম

দোষ করছে। খুকীতো কখনও খারাপ কিছু করে না, হঠাৎ সেই বই বিক্রী করতে গেলই বা কেন? ও তো কখনো একটাও পয়সা বাজে খরচ করে না।

হিমানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তাপসী তাকে বলল, তুই এখন যা চোখ মুছে ফ্যাল। শোন, যদি কখনো তোর টাকা-ঠাকা লাগে তুই বলবি। বইটই বিক্রী করিস না—

মানসী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই কোথায় টাকা পাবি?

তাপসী বলল, সে আমি যেখানেই পাই! সে কথা তোকে ভাবতে হবে না!

মানসী আস্তে আস্তে বলল, আমাকে সব ভাবনা থেকে নিষ্কৃত দে না তোরা! তাহলে আমি বেঁচে যাই!

ছোট বোনকে চড় মেরে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল মানসীর। না খেয়ে দেয়ে শুয়েছিল বিছানায়। বাইরের শাড়ি ছাড়েনি। কান ও নাকের ডগা জবালা করছে। কিছু ভাল লাগছে না! ইচ্ছে করছে এক্ষুনি বাড়ি থেকে চলে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে! দুচোখ যেখানে যায়। মানসীর দু'চোখ এখন ঘরের ছাদ দেখছে। বাইরে অন্ধকার।

হিরণ্ময়দা বলেছিলেন, শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই সব নয়। এসব ছাড়িয়ে মানুষের আরও উঁচুতে ওঠার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু শুধু বেঁচে থাকাটাই এমন শক্ত এখন অন্য যে কিছুরই আর মনেই পড়ে না! সেই জন্যই কি এত রাগ হয় মাঝে মাঝে?

মা শিয়রের কাছে এসে বললেন, চলু, খাবি না!

ধরা-গলা, মা একটু আগেও কাঁদছিলেন। এইসব কান্নাকাটি আর ভাল লাগে না মানসীর। সব সময়ই তো একটা কিছু লেগেই আছে। মানসী কখন একটু একা থাকারও সময় পাবে না?

মানসী কোন উত্তর দিল না।

—এই মানু, ওঠ্!

—আমি খাব না। আমার ক্ষিদে নেই।

—শুধু শুধু কেন নিজের শরীরটা নষ্ট করবি! যা ইচ্ছে করে, একটুখানি মুখে দিবি চল!

—থাক্, আমার শরীর নিয়ে তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না!

—তোরা সবাই আমাকে দোষ দিস্ ! আমি কি করব বলতো ?

কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না মানসীর। টপ করে উঠে পড়ে বলল, ঠিক আছে, খাবার দাও আমি খাচ্ছি।

রাত্তিরে এ বাড়িতে বরাবর রুটি খাওয়া হয়। মানসী রুটি খেতে একদম ভালবাসে না, মা সে কথা জানেন। ছেলে মেয়েদের কার কোন খাবারটা পছন্দ অপছন্দ মায়ের তা মুখস্থ। কিন্তু দুবেলা ভাত রাঁধলে চালানো যায় না, রেশনে চাল অধিকাংশ সপ্তাহেই অখাদ্য। বাইরে বাজারে অঢেল চাল পাওয়া যায়, কিন্তু আগুন দাম। মা আগে আগে বলতেন, অন্যরা রাত্রে রুটি খায়—কিন্তু মানসী যখন রুটি খেতে পারে না—তার জন্য শুধু ভাত হোক্। মানসী রাজী হয় নি। অন্যদের থেকে আলাদা কিছু ব্যবস্থা সে নিজের জন্য করতে কখনো রাজী নয়। তবু মানসীর কথা না শুনেই মা দু'একদিন রাত্তিরে তার জন্য আলাদা ভাত রেঁধে-ছিলেন—মানসী রাগের বসে তা স্পর্শই করে নি। লাভের মধ্যে এই হয়েছিল যে, সেইসব রাত্তিরে মানসীর খাওয়াই হয় নি।

হিমানী আজ খাবে না—সে সেই যে কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়েছে, তাকে আর কিছুতেই ওঠানো যাবে না এখন। এমনিতে শান্ত ও চুপচাপ থাকে হিমানী, কিন্তু বড় জেদী মেয়ে।

মানসী নিজেই উঠে গেল তাকে ডাকতে। কাঁদতে কাঁদতে হিমানী ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব কষ্ট হল মানসীর। এ বাড়ির সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান, এক সময় কত আদরের ছিল। বাবা ওকে কী ভালই বাসতেন। সে আজ তার দিদির কাছে মার খেয়েছে। মানসী কোন দিন ভাইবোনের গায়ে হাত তোলে না—আজ এমন রাগ চড়ে গেল--

মানসী নরম গলায় ডাকল, এই হিমানী ওঠ্ ! লক্ষ্মী মেয়ে, আর কোনদিন মারব না। ওঠ্—

হিমানী চোখ মেলে তাকালো। ঘুমের মধ্যেও তার চোখে অভিমান লেগে আছে। কিশোরী জীবনের তীব্র অভিমান।

মানসী সেটা বুঝতে পারল। হিমানীর হাত ধরে জোর করে টেনে তুলে বলল, লক্ষ্মীসোনা, ওঠ্। তোর দিদিটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, নারে ?

হিমানী দিদির বুকে মাথা রাখল। যেন সে আবার খুব বাচ্চা হয়ে গেছে। ফিসফিস করে বলল, না দিদি, তুমি খুব ভাল। আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। সত্যি বলছি, রাগ করিনি।

ডালের মধ্যে রুটি ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মানসী জিজ্ঞেস করল, রঞ্জু আজও আসে নি?

তাড়াতাড়ি রঞ্জুর দোষ চাপা দেবার জন্যে মা বলে উঠলেন, হ্যাঁ এসেছিল দুপুরবেলা।

মানসী বলল, রাত্তিরে উনি কোথায় থাকবেন?

—বলল তো ওর কি বিশেষ কাজ আছে।

—ষোল বছরের ছেলের এমন কি বিশেষ কাজ থাকে যে রাত্তিরে তাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হবে? আর তুমি সেটা প্রশয় দিচ্ছ? কি বিশেষ কাজ শুনি?

—তা তো বলল না।

—এইরকম ভাবে কতদিন চলবে?

মা বিমর্ষভাবে বললেন, তা হলে আমি কি করব? বাড়িতে ঢুকতে দেব না? দরজা বন্ধ করে রাখব?

—মা, তুমি কি করছো বুঝতে পারছো না? তুমি ছেলেটার সর্বনাশ করছো!

—আমি কি করবো বল তো?

দিন চারেক ধরেই রঞ্জু বাড়িতে থাকছে না রাত্তিরে। মাঝে মাঝে নাকি দুপুরবেলা দু'এক ঘণ্টার জন্য বাড়ি ফেরে, তখন মানসীর সঙ্গে দেখা হয় না। কোন বোনের সঙ্গে দেখা হয় না। তখন সে চান করে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে মাকে ধন্য করে দেয়। মা পাশে বসে যত্ন করে খাওয়াতে খাওয়াতে গুন গুন করে অনেক অভিযোগ শোনান—সে সবে সে কর্ণপাত করে না। আবার বেরিয়ে যাবার সময় মায়ের কাছ থেকে দুটো চারটে টাকা চেয়ে নিয়ে যায়। সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে অতিকষ্টে দু'পাঁচ টাকা সরিয়ে রাখেন মা, আপদ-বিপদের জন্য, বুকের পাঁজরার মতন সেই টাকা দিতে হয় ছেলেকে। হাজার হোক একমাত্র ছেলে তার সম্পর্কে কোন যুক্তি খাটে না।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি করব বলতে পারিস? কাদের

কথা তো শুনবে না। কিন্তু কখনো যদি সে বাড়ি ফেরে তাহলে তাকে ঢুকতে না দিয়ে কি দরজা বন্ধ করে দেব? কোন মা তা পারে?

মানসী বলল, কাল সকালে আমি দীপকদার কাছে যাব। গিয়ে সোজাসুজি কৈফিয়ৎ চাইব। উনি ভেবেছেন কি? একটা বাচ্চা ছেলেকে এরকম ভাবে নষ্ট করছেন, আর সেই সঙ্গে আমাদেরও দগ্ধে দগ্ধে মারছেন।

তাপসী এতক্ষণ বাদে কথা বলল। থালায় দাগ কাটতে কাটতে বলল, দীপকদা ওকে নষ্ট করছেন একথা তুই বলতে পারিস না দিদি। দীপকদা ওকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন।

—এই বুঝি বাঁচানোর নমুনা? দিনের পর দিন বাড়ি ফেরে না, এইটুকু ছেলে।

—আগেই বা কি ছিল? আগেও কারুর কথা শুনত?

ছেলেবেলা থেকেই আদর দিয়ে দিয়ে রঞ্জুর মাথা খাওয়া হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের চেয়ে ছেলের দাম অনেক বেশি। এ বাড়িতে তিন মেয়ে আর ও একমাত্র ছেলে—তাইতেই হয়ে গেল আলালের ঘরের দুলাল। পড়াশুনোয় কোনদিন মন ছিল না—ক্লাস এইটে পর পর দু বছর ফেল করার পর পড়াশুনোই ছেড়ে দিল বলতে গেলে। স্কুল যাবার নাম করে না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আড্ডা মারতে যায় বখাটে ছেলেদের সঙ্গে। নোংরা খিস্তি খেউর আর সিগারেট টানতে শিখল। চোদ্দ বছর বয়েসে প্রথম সিগারেট খাওয়ার জন্য ধরা পড়ায় একদিন খুব বকুনি দেওয়া হয়েছিল, তাইতে ছেলে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেল। তারপর থানা থেকে পুলিশ করা হল তার জন্য, তিনদিন পরে আপনিই ফিরে এল। তখন থেকেই রঞ্জু একেবারে বেপরোয়া, কারুর কথা শুনত না। মাঝে মাঝে ছিঁচকে চুরির অভিযোগও তার নামে। ক্রমশ সে রেলের ওয়াগান ব্রেকারদের দলে গিয়ে ভিড়ছিল।

তাপসী বলল, আগে ও একেবারে গোল্লায় যাচ্ছিল। তবু তো দীপকদা ওকে খানিকটা ফেরাতে পেরেছেন। ওকে দিয়ে দেশের কাজ করাচ্ছেন।

মানসী বলল, দেশের কাজ! বললেই আমি শুনব? রঞ্জু করবে দেশের কাজ? পড়াশুনো করে নি, দেশের ইতিহাস ভূগোল কিছু জানে না, সে করবে দেশের কাজ? যে সে অমনি দেশের কাজ করলেই

হল ? যে-ছেলে নিজের মায়ের দুঃখ বোঝে না, সে বুঝবে সারা দেশের মানুষের দুঃখ !

তাপসী বলল, কিন্তু দীপকদা তো মানুষ খারাপ নন। ওঁর একটা কিছু আইডিয়ালিজম আছে। ছেলেবেলা থেকে তো দেখছি কখনো কোনো খারাপ কাজ বা খারাপ কথা ওঁকে বলতে শুনিনি।

—দীপকদার আইডিয়ালিজম থাকতে পারে, কিন্তু এইসব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের কেন ক্ষ্যাপাচ্ছেন, তা আমি বুঝতে পারি না ! ওদের লেখাপড়া ছাড়িয়ে, স্কুল কলেজে আগুন লাগিয়ে - শেষ পর্যন্ত কি হবে ওদের ? ওরা আর মানুষের মতন মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে কোনদিন ? অন্তত কি করতে চান ওদের নিয়ে সেটা আমাদেরও তো বুঝিয়ে বলতে পারতেন ? মায়ের কাছ থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে দেশের কাজ হয় ?

—তা জানি না ! কিন্তু দীপকদার কথা শোনে তো ওরা। সেদিন রঞ্জুকে দেখলুম, ভাঙা পা নিয়ে দীপকদার পেছন পেছন যাচ্ছে। এখন আর বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেশে না—

—ম্যাজিশিয়ানরাও মানুষকে ভোলাতে পারে। তাহলেই সেটা মহৎ কিছু না—

খাওয়া ছেড়ে হিমানী হঠাৎ উঠে পড়ল। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ছুটে চলে গেল বাথরুমে। হড়হড় করে বমি করে ফেলল। মা তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস করল, কি হল ? বমি করছিস কেন ? খাবারে চুল পড়েছিল ?

সারা মুখটা কুঁচকে গেছে হিমানীর। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না কিছু না। এমনই হঠাৎ—

হিমানীর সেই পেট ব্যথাটা আবার জেগেছে। অসহ্য পেট ব্যথা। কিন্তু সে কথা সে কারুকেই বলবে না। তার মরে যাওয়াই ভাল। সে মরলে কারুর তো কোন ক্ষতি নেই। বরং বাড়ির লোককে আর তার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। একটা দুশ্চিন্তা কমবে।

সাত

যতজন অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে, তার দ্বিগুণ লোক ভিড় করে আছে ঘরটার মধ্যে। টেবিলগুলো একপাশে সরিয়ে খালি করে দেওয়া হয়েছে মাঝখানের জায়গাটা। চেয়ারগুলো দেয়াল ঘেঁষে সাজানো। একটি চেয়ার একটু আলাদা করা, সেখানে বসেছেন স্বপন চৌধুরী, তিনি এই নাটকের পরিচালক। নানান অফিস ক্লাবের নাটক পরিচালনা করাই তাঁর উপজীবিকা—স্থায়ী ভাবে তিনি একটি প্রোফেশনাল স্টেজের প্রমপটার। প্রমপটার হিসেবে তাঁর নাম অবশ্য স্বপন চৌধুরী নয় পিনটু চৌধুরী। কিন্তু পরিচালক হতে গেলে একটা মনোরম নাম না হলে মানায় না।

চেহারা ও নামে এত তফাৎ খুব কম দেখা যায়। অসম্ভব লম্বা ও চোয়াড়ে চেহারা। লম্বা বলেই বেশী রোগা দেখায়—মনে হয় শরীরে হাড় ও চামড়া ছাড়া এক ছিটে মাংস নেই। বিশেষত তার গালের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যায়। অথচ, তার চেহারাটা রুগ্ন বলা যায় না—দেখলে বরং মনে হতে পারে, পিনটু ওরফে স্বপন চৌধুরীর কোনদিন অসুখ করে না—তার এই চেহারা আগামী পঁচিশ তিরিশ বছরের মধ্যেও বদলাবে না।

মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব পরিবেশ অনুযায়ী কতখানি আলাদা হয়ে যেতে পারে, তা স্বপন চৌধুরীকে দেখলেই বোঝা যায়। যখন তাঁর নাম পিনটু চৌধুরী, মিনার্ভা বা বিশ্বরূপার প্রমপটার—তখন তাঁকে কেউ পাত্তা দেয় না, কথায় কথায় লোকের ধমক খেতে হয়। কেউ তাঁকে ডাকে পিনটে, কেউ ডাকে লম্বু। গলার আওয়াজটা ফ্যাসফেসে বলে স্টেজে কোনোদিন পার্ট করার চান্স পেলেন না—কিন্তু প্রমপটার বেশ উপযোগী। সার্কাসের ক্লাউনকে যেমন সব খেলাই বেশ ভালোভাবে জানতে হয়, তবু সে ক্লাউনই থাকে, তেমনি প্রমটার পিনটু চৌধুরী সমস্ত ভূমিকায় প্রতিটি ছোটোখাটো অভিব্যক্তি দেখাতে পারলেও শেষ পর্যন্ত একজন নগণ্য প্রমপটার।

কিন্তু যখন তিনি স্বপন চৌধুরী, অফিস ক্লাবের সৌখিন থিয়েটারের পরিচালক—তখন তাঁর আলাদা গাম্ভীর্য। এখানে সবাই তাঁকে খাতির করে, এখানে তিনি সবাইকে হুকুম করতে পারেন। এমনকি কাকে কোন্ পার্ট দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত। কেউ কখনো তাঁর কোনো কথা অমান্য করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, তাহলে আপনারাই নিজেরা যা ভালো বোঝেন করুন। আমার দ্বারা হবে না! সবাই তটস্থ হয়ে যায়। স্বপন চৌধুরীর যোগ্যতা সম্পর্কে কারুর মনে কোনো সংশয়ই দেখা যায় না। এমন কি মেয়েদের ভূমিকাগুলোও তিনি মেয়েদের গলায় এমন চমৎকার দেখাতে পারেন! তাঁর মতন ঠোঁট কাঁপিয়ে মেয়েলি কান্নায় অভিনয় দেখাতে মেয়েরাও পারে না।

এতগুলো পুরুষের মধ্যে তিনটি মেয়ে বসে আছে। মল্লিকা আর গীতা এই অফিসের আগের দু'তিন বছরের নাটকেও পার্ট করেছে, এখানকার অনেককে তারা নাম ধরে চেনে। তাদের মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা নেই। তাপসী নতুন। শুধু এখানে নয়, এর আগে কোনোদিন সে অভিনয়ই করেনি—কখনো এত অনাত্মীয় পুরুষকে তার নাম ধরে ডাকতে শোনেনি। বিশেষ কোনো দিকে তাকাতেও তার সাহস হয় না—তাহলে চোখে পড়বে, কেউ না কেউ তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তাপসীর মুখ মাটির দিকে।

চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে স্বপন চৌধুরী বললেন, সাইলেন্স! থার্ড অ্যাক্টের সেকেণ্ড সীনটা আবার হোক।

ক্লাবের সেক্রেটারি যিনি তিনিই এ বইয়ের নায়ক। ফর্সা চেহারার সুপুরুষ, তলোয়ারের মতন গোঁফ। দেখলে মনে হয়, সিনেমার নায়ক হবার জন্যই তার জন্ম, ভাগ্যদোষে ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক্যাশিয়ার হয়েছে। জোরালো গলা, অভিনয় বেশ ভালোই করে।

সেক্রেটারি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আরম্ভ হোক। শচীপতির এণ্ট্রেস। তারপর আমি ঢুকবো। আমার সঙ্গে সুদেব—সুদেব তো আসেনি; কে প্রক্সি দেবে? গুপ্তদা, আপনি একটু প্রক্সি দিয়ে দিন না—

স্বপন চৌধুরী বললেন, নো প্রক্সি বিজনেস! অনবরত প্রক্সি দিয়ে রিহার্সাল হয় না। পরের সীন ধরুন! পরের সীনে কে কে আছে?

বিজয়েন্দ্র আর সন্দেষ্ণা! ঠিক আছে, এই সীনটাই ভালো করে হোক। উঠুন, উঠুন!

তাপসীর বুক কেঁপে উঠলো। বারবার এই সীনটার রিহার্সালই যে কেন হয়! এই সীনে তাপসীর অনেকখানি পার্ট। কিছুতেই সে সহজ হতে পারে না। এক এক সময় তার মনে হয়, সে একটা সাঙ্ঘাতিক ভুল করেছে। অভিনয় টভিনয় তার দ্বারা হবে না। অথচ আর কী পথই বা আছে।

দরজার কাছে হেলান দিয়ে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাপসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, নিন, উঠুন। আপনাকে আগে ঢুকতে হবে।

এই ভদ্রলোকের কোনো পার্ট নেই, কিন্তু তাঁকে সবাই খাতির করে এখানে। বোধহয় ক্লাবের হোমরা চোমরা কেউ হবে। সবাই ডাকে গুপ্তদা গুপ্তদা বলে। ভদ্রলোক রিহার্সালের সময় আগাগোড়া উপস্থিত থাকেন. কিন্তু অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কোনো পার্ট নেন নি।

তাপসী উঠে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়ালো, প্রমপটার পাশে বই নিয়ে রেডি। নাটকটি অতি বাজে - সাধারণত যেরকম হয়। জমিদারের ছেলের সঙ্গে গরীবের মেয়ের প্রেম, তারই মধ্যে খুন ও প্রচুর কান্নাকাটি। এই দৃশ্যে তাপসীর সঙ্গে নায়ক অর্থাৎ সেক্রেটারি বেশ অনেকক্ষণ ধরে ফাজলামি করবে।

স্বপন চৌধুরী চেঁচিয়ে উঠলেন, উঁহু, কিছু হচ্ছে না। বড্ড আড়ষ্ট! আবার গোড়া থেকে হোক।

তাপসীর দিকে তাকিয়ে বললেন. তুমি ভাই হাত দুটো ছেড়ে দাও তো! সব সময় হাত দুটো বুকের কাছে আড় করে রেখেছো কেন? সহজ ভাবে হাঁটো —ব্যাপারটা তুমি এনজয় করছো—

তাপসী এই বইয়ের নায়িকা নয়। নায়িকার পার্ট করছে গীতা—সে খুব ঝানু অভিনেত্রী। তাপসী একজন অত্যন্ত ধনী শিল্পপতির মেয়ে, যার সঙ্গে নায়কের বিয়ে দেবার খুব চক্রান্ত চলছে। জমিদারের আদর্শবাদী ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করার ভার তাপসীর ওপর।

স্বপন চৌধুরী নিজে উঠে এলেন এবার। তাপসীকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। কাল্পনিক শাড়ীর আঁচল আঙুলে পাকাতে পাকাতে মুখে নারী

সুলভ মোহময়ী ভঙ্গী করে বললেন, তোমার জন্য আমার মন কেমন করে, তুমি বুঝি একটুও বুঝতে পারো না? আমার মুখের দিকে তাকাও? কিছু দেখতে পাচ্ছো?

অপূর্ব কায়দায় এইটুকু দেখিয়ে সরে এসে স্বপন চৌধুরী তাপসীকে বললেন, বুঝলে তো ভাই, ঠিক এমনি করে—। মুখের দিকে তাকাও—এইটুকু যখন বলবে, তখন খানিকটা অভিমান আর খানিকটা ছেনালি, ইয়ে মানে, একটু ইয়ে আর কি—। নাও, করো তো ভাই। একটু ফিলিংস দিয়ে—

মেয়েদের ভাই বলে সম্বোধন করা স্বপন চৌধুরীর মুদ্রাদোষ। কাউকে তিনি আপনি বলেও কথা বলেন না।

তাপসী পার্টটা বলে গেল। নায়ক যেই উত্তর দিতে যাচ্ছে, স্বপন চৌধুরী বললো, আবার! হলো না—।

প্রথম থেকে শুরু হলো। খানিকদূর এগিয়েছে, পরিচালক ফের বললেন, হচ্ছে না। একদম হচ্ছে না! কাঠের পুতুলের মতন—

রিহার্সাল শেষ হলো আটটার সময়। তবুও কারুর চলে যাবার তেমন তাড়া নেই। দু'চারজন যাদের ট্রেন ধরার তাড়া আছে—তারা দৌড়েছে। তাপসীকেও ট্রেন ধরতে হবে. কিন্তু সে এক্ষুণি যেতে পারছে না। প্রত্যেকদিন রিহার্সাল দেবার পর বাড়ি ফেরার জন্য ওদের ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দেবার প্রথা আছে। তাপসী অবশ্য ট্রামেই যায়—কিন্তু টাকাটা ছাড়তে পারে না। মল্লিকা আর গীতা কলকাতাতেই থাকে—ওরা এই অফিসেরই কারুর না কারুর সঙ্গে একসঙ্গে যায়।

স্বপন চৌধুরী, ক্লাবের সেক্রেটারি আর গুপ্তদা নামের সেই ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করছিলেন। স্বপন চৌধুরী হাত ছানি দিয়ে তাপসীকে ডেকে বললেন, এই যে ভাই, শোনো—।

গীতা. মল্লিকা আর তাপসী এক সঙ্গে বসে ছিল। গীতার মুখটা আলগা। ফিসফিস করে সে প্রায়ই অসম্ভব সব খারাপ কথা উচ্চারণ করে। ক্লাবের সেক্রেটারি এবং নাটকের নায়ককে সে আড়ালে নাম দিয়েছে কার্তিক। প্রায়ই সে বলে, নবকার্তিকের ঘাড়টা কি রকম নরম তুলতুলে না! দেখলেই ঘাড় মটকাতে ইচ্ছে করে!

তাপসী উঠে দাড়াতেই গীতা বললো, দেখো ভাই, আমার নব-কার্তিকের দিকে হাত বাড়িয়ো না !

মল্লিকা বললো, আগে মেয়ের কত তাড়া ছিল বাড়ি ফেরার। আজ-কাল আর সেসব মনেই পড়ে না। রাত্তিরে যদি বাড়ি না ফেরো—তাহলে আমার ঘরে এসে থাকতে পারো।

তাপসী ওদের কথার কোনো উত্তর দিল না। এগিয়ে গেল। স্বপন চৌধুরী থিয়েটারি কায়দায় পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইলেন তাপসীর দিকে নিঃশব্দে। তারপর বললেন, দ্যাখো ভাই, আমি সোজাসুজি কথার মানুষ। আমি থিয়েটার করতে এসেছি, থিয়েটার বুঝি, অন্য কিছু বুঝি না। তোমাকে একটা কথা বলবো ?

তাপসী উদ্বিগ্ন ভাবে বললো বলুন।

—তোমার দ্বারা অভিনয় হবে না !

তাপসী আকাশ থেকে পড়ল ! এ রকম কথা সে প্রত্যাশাই করে নি। তার মুখখানা রক্তহীন হয়ে গেল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো স্বপন চৌধুরীর দিকে।

—তুমি ভাই আগে কোথাও অভিনয় করেছো, সত্যি করে বলো তো ?

মিথ্যে কথা বলা তাপসীর এখনও রপ্ত হয়নি। তবু জোর করে গলার আওয়াজ স্বাভাবিক করার চেষ্টা ক . বললো, হ্যাঁ করেছি, দু'তিন জায়গায়—

—সে ভাই কোন্ ডিরেক্টার তোম ' হ্যাণ্ডেল করেছে, জানি না। আমার দ্বারা হবে না। এক একজনে দ্বারা থিয়েটার হয়, এক একজনের দ্বারা হয় না। তোমার দ্বারা হবে না।

—আমি যদি আরো ভালো করে চেষ্টা করি ?

—চেষ্টা তো কম করছো না ? কিন্তু অ্যাকটিং তোমার ধাতুতে নেই।

তাপসীর বুকের মধ্যে দুপদুপ করছে, এরা তাকে ছাড়িয়ে দেবে ? এরা তাকে পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দিয়েছিল—সেটা ফেরৎ দিতে হবে ? সাত আট টাকা খরচ হয়ে গেছে যে ?

সেক্রেটারি বললো, দেখুন, মিস সেনগুপ্ত, আপনাকে আমাদের এমনিতে তো পছন্দ হয়েছিল, আপনার চেহারা আর ভয়েসও বেশ মানিয়ে

গেছে, কিন্তু আপনি আড়ষ্টতা কাটাতে পারছেন না। স্বপনদা বলছেন, আপনার পার্টে একদম ফিলিং আসছে না। আমাদের তো আর বেশী দিন দেরীও নেই—

স্বপন চৌধুরী বললেন, ফিলিং আসছে না মানে কি। একেবারে কাঠের পুতুল! ওকে হিরোর হাত চেপে ধরতে হবে, একটুখানি ছেনালি মানে ইয়ে করতে হবে—কিন্তু ওর ভাব দেখলে মনে হয় কোনোদিন কোনো ছেলের হাতটাত ধরে নি। এসব মেয়েকে দিয়ে অভিনয় হয়?

পরিচালক থুতনিতে আঙুল দিয়ে বললেন, এখন তা হলে আবার কাকে ঠিক করা যায়! আর মোটে তিনটে রিহার্সাল—এর মাধ্যে কোনো নতুন মেয়েকে এনে আবার পার্ট মুখস্থ করানো—

গুপ্তদা নামের ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবারে বললেন, না, না, ঠিক আছে। ইনিই পারবেন! স্বপন বাবু, আপনি এ লাইনে এতদিন আছেন, একটা মেয়েকে তৈরী করে নিতে পারবেন না? তাহলে আর আপনি কিসের পরিচালক? এ অফিসের যারা পার্ট করছে, তারা সবাই কি অ্যাক্টর? তাদের যখন নিতে পারছেন—

স্বপন চৌধুরী একটু নরম হয়ে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তৈরী করা যাবে না কেন? সবাইকেই তৈরী করা যায়—যদি কো-অপারেশন থাকে, যদি টাইম পাওয়া যায়—

—কো-অপারেশন পাবেন না কেন? ইনি আর একটু মন দিয়ে করলেই···কি মিস সেন, পারবেন না?

তাপসী সঙ্গে সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, আমি পরের দিন থেকে খুব মন দিয়ে করবো।

স্বপন চৌধুরী বললো, ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখা যাক।

সেক্রেটারি বললেন, কিন্তু স্বপনদা, আমাদের প্লে-টা যদি ঝুলে যায়—

গুপ্তদা হাত উঁচু করে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, আরে স্বপন চৌধুরীর মতন ডিরেকটার থাকতে প্লে কখনো ঝুলতে পারে! তুমিও যেমন!

তারপর তিনি তাপসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি যান। পরের রিহার্সালে একটু প্রাণ ঢেলে অভিনয় করবেন! বুঝলেন?

গুপ্তদা নামের লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাপসীর মন ভরে গেল। লোকটির সঙ্গে এর আগে একদিনও তার কথা হয়নি। অথচ লোকটি তার পক্ষ নিয়ে এরকম বলতে গেল কেন?

ওদের কাছে ফিরে আসার পর তাপসীকে আর কিছু বলতে হলো না। মল্লিকা আর গীতা বুঝতে পেরেছে। গীতা ঠোঁট উল্টে ফিসফিস করে বললে, উঁ! ভারী উনি অ্যাকটিং বোঝেন। যে-সে আজকাল ডাইরেক্টার সেজে বসলেই হলো! প্রমপটারও ডাইরেক্টার!

মল্লিকা বললো, এই মেয়ে, মন খারাপ করিস নি! প্রথম প্রথম এরকম অনেক শুনতে হয়। এ লাইনে থাকতে গেলে একটুতেই মন খারাপ করলে চলে না।

অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে তাপসী হাঁটতে লাগলো ট্রাম স্টপের দিকে। মনটা হঠাৎ খুব খারাপ লাগছে। অপমানিত এবং নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে। স্বপন চৌধুরীর এ কথা শোনার পর তার কি উচিত ছিল না—তক্ষুণি ওখান থেকে চলে আসা? কিন্তু তারপর? আর কোনো পথ দেখতে পাওয়া যায় না!

ঝট্ করে একটা গাড়ি এসে থামলো তাপসীর পাশে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গুপ্তদা গম্ভীর হুকুমের সুরে বললেন, উঠে পড়ুন!

তাপসী হকচকিয়ে গেল। কিন্তু গুপ্তদা তাকে ভাববারও সময় দিলেন না। গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে বিরক্ত ভাব দেখিয়ে বললেন, আঃ, চটপট উঠে পড়ুন! পেছনে অন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে।

তাপসী তবু বললো, আমি ট্রামে উঠবো—

—না, ট্রামে উঠতে হবে না। উঠুন শিগগির।

পেছনের গাড়ি হর্ণ দিচ্ছে।

তাপসী দিশেহারার মতন উঠে পড়লো গাড়িতে। স্টার্ট দিয়ে গুপ্তদা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন ট্রামে চেপে?

—হাওড়া।

—হাওড়াতেই বাড়ি, না ট্রেন ধরতে হবে?

—আমি চুঁচড়োয় থাকি।

—চিন্তার কিছু নেই। ট্রেন ধরিয়ে দেবো এখন।

গাড়ি কিন্তু হাওড়ার দিকে গেল না। বেঁকলো আউটরাম ঘাটের দিকে। তাপসী সন্ত্রস্ত হয়ে বললো, এ কি, কোন্ দিকে যাচ্ছেন?

গুপ্ততা মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলেন, চিন্তার কিছু নেই।

—কিন্তু আমি হাওড়ায় যাবো।

—ঠিক আছে হাওড়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না। একটু বাদে গেলেই হবে।

—আমার দেরী হয়ে যাবে।

—হোক।

তাপসী আর কি বলবে ভেবে পেল না। তার বেশ ভয় করছে। লোকটিকে সে চেনেই না ভালো করে, এই গাড়িতে ওঠাই ভুল হয়েছে। একটু আগে ভদ্রলোকের কথা ভেবে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছিল, এখন আবার মনে হচ্ছে, লোকটার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই তো?

একটু কঠিন হবার চেষ্টা করে তাপসী জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—গঙ্গার ধারে।

—কেন?

—এমনিই, আপনার সঙ্গে দু' একটা কথা বলবো।

—কি কথা? তা এখানে বলা যায় না? আপনার সঙ্গে তো আমার অন্য কিছু কথা থাকতে পারে না!

—আমার থাকতে পারে!

—আমার তাতে কোনো আগ্রহ নেই। আপনি আমাকে এখানে নামিয়ে দিন।

—রাগারাগি করার কোন দরকার নেই। আমি গুণ্ডা বা বদমাইস নই।

আউটরাম ঘাট পেরিয়ে গঙ্গার ধারে এক জায়গায় গাড়ি থামলো। গুপ্তদা বললেন, আমরা কি নামবো, না গাড়িতে বসেই কথা বলবো?

—যা বলবার এখানেই বলুন।

—গাড়ি থামিয়ে ভেতরে বসে থাকলে ভিখিরির ছেলেরা এসে বিরক্ত করবে।

—করুক।

—বাইরে বেশ চমৎকার হাওয়া ছিল।

—আপনি কেন আমায় দেরী করিয়ে দিলেন বলুন তো?

—আচ্ছা ঠিক আছে।

গুপ্তদা সীটে হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। আড়চোখে তাকালেন তাপসীর দিকে। সময় দেখলেন ঘড়িতে। তারপর বললেন, আপনি করে বলতে হবে, না তুমি বলবো? আমি মেয়েদের বেশীক্ষণ আপনি আপনি করতে পারি না। তা ছাড়া, তোমার ডবল বয়েস আমার। তোমার বয়েস কত? উনিশ? কুড়ি? যদি একুশও হয়, আমার বেয়াল্লিশ? তুমি আমার পরিচয় জানো?

তাপসী কোনো উত্তর না দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

—আমার পুরো নাম হচ্ছে সুধীন গুপ্ত। সবাই আমাকে শুধু গুপ্তদাই বলে। আমাদের অফিসে আমি অ্যাকাউণ্টস অফিসার। বিয়ে করিনি। এলগিন রোডে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি। আমি যা মাইনে পাই তার সবটাই উড়িয়ে দিই। কি, এই পরিচয়ই যথেষ্ট তো? দেখি তোমার হাতটা দেখি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তদা ঝুঁকে তাপসীর একটা হাত ধরতে এলেন। তাপসী তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললো, একি, হাত ধরছেন কেন?

প্রাণখোলা ভাবে হেসে গুপ্তদা বললেন, হাতের রেখাগুলো দেখবো। আমি হাত দেখতে জানি।

গাড়ির মধ্যে আবছা অন্ধকার। এর মধ্যে হাতের রেখা দেখার প্রস্তাব অসম্ভব। তাপসী বললো, আমি ওসবে বিশ্বাস করি না!

—আমিও বিশ্বাস করি না। তবু আমি মেয়েদের হাত দেখতে ভালোবাসি। যাকগে, আমি সোজাসুজি কথার মানুষ। তোমাকে কি আজ বাড়ি ফিরতেই হবে? নাকি আমার ফ্ল্যাটে যাবে?

তাপসী এবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। গলায় কানে যেন নিঃশ্বাস আটকে আসছে। গাড়ির একেবারে কোণে গিয়ে কাতর গলায় বললো, আমাকে এ সব কথা বলছেন কেন? আমাকে দয়া করে হাওড়ায় পেঁছে দিন, কিংবা এখানেই নেমে যাচ্ছি—আমি নিজেই চলে যাবো।

গুপ্তদা তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তাপসীর দিকে। পুরো এক

মিনিট কি দেড় মিনিট যেন তিনি তাপসীর ভেতর পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করছেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, শোনো, লোকে যাদের ভালো লোক বলে, আমি তা নই। কিন্তু গুন্ডামি ছ্যাঁচড়ামিও করি না আমি। সেদিক থেকে তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু, আমি যা বলতে চাইছি, তুমি কি তা বুঝতে পারছো না?

—না।

—আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার মতন সব মেয়েই এসব কথা বোঝে। তোমার না বোঝার ভান করার কারণ কি? আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি?

—আপনি কি বলছেন, আমি সত্যি বুঝতে পারছি না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।

গুপ্তদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বেশ খুশীর সঙ্গেই বললেন, তোমাকে আমি যা ভেবেছিলাম, এখন দেখছি ঠিক তাই। তুমি ভুল পথে এসেছো। তুমি থিয়েটার করতে এসেছো কেন?

তাপসী কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। একটু ইতস্তত করে বললো, অনেকেই তো করে।

—কিন্তু তুমি তো অভিনয় জানো না।

—শিখে নেবো আস্তে আস্তে।

—না, শেখো না। শিখবার দরকার নেই। কোনো মেয়ে অভিনয় করতে জানে না—এইটাই একটা দুর্লভ ব্যাপার। সেইজন্যই তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে যে আর একজন আছে, গীতা, ও বড্ড বেশী অভিনয় জানে। ও বিছানায় শুয়েও অভিনয় করে। যাকগে, ঐ গীতা তো কয়েকবার গেছে আমার ফ্ল্যাটে, তুমি যাবে না কেন?

—আপনি দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

—তা হলে আমার আগের প্রশ্নটার উত্তর দাও। তুমি অভিনয় লাইনে এসেছো কেন? স্বপন চৌধুরী পরিষ্কার বললো, তোমার দ্বারা অভিনয় হবে না, রীতিমতন অপমান করলো তোমাকে—তবু তুমি চুপ করে রইলে। কেন?

—আমার টাকা রোজগার করা খুব দরকার।

—টাকা রোজগারের আর কোনো রাস্তা পেলে না?

—না, মানে, চাকরি টাকরি পাওয়া তো সহজ নয়—

—লেখাপড়া শিখেছো কিছু?

—হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছি। পার্ট ওয়ান পড়ি।

—বাড়িতে কে কে আছে?

—আমার মা, দিদি, এক ছোট বোন।

—বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই?

—আমার একটি ছোট ভাই আছে—আমার বাবা বেঁচে নেই।

—হুঁ। বুঝলাম। বাড়িতে রোজগার করার কেউ নেই?

—হ্যাঁ, আছে। আমার দিদি চাকরি করে। দিদিই সংসার চালায় —দিদিকে খুব খাটতে হয়—তাই আমি যদি দিদিকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি—

—অ্যামেচার থিয়েটার করার ব্যাপারটা তোমার মাথায় কে ঢোকালো?

—আমাদের কলেজের একটি মেয়ে। সে আমাকে মল্লিকাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

—এটা তোমার পক্ষে ঠিক পথ নয়।

—কেন?

গুপ্তদা তাপসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, উত্তরটা যদি ঠিক মতন দিই, খুব নিষ্ঠুর শোনাবে। তুমি এসেছো একটা অভাবের সংসার থেকে, তোমাদের অনেক কষ্ট—আমার পক্ষে কি এখন নিষ্ঠুর কথা বলা উচিত? কিন্তু আমি ভাবছি, তোমার বয়েসী একটি মেয়ে যদি সত্যিকারের অভাবে পড়ে টাকা রোজগার করতে চায়—তাহলে তার পক্ষে কি কি পথ খোলা আছে? যাকে বলে ভদ্র উপায়, তার তো একটাও নেই দেখছি। চাকরি বাকরি জোটানো একেবারে ইমপসিবল বলা যায়। ধূপ ধুনো ফিরি করতে পারবে রাস্তায় রাস্তায়? তুমি পারবে? না। বিহারের গ্রাম থেকে আসা হিন্দুস্থানী বুড়িরা বাইরে থেকে কলকাতায় চাল পাচার করে দিব্যি রোজগার করে, তুমি তা পারবে? পারবে না। কোনো আশ্রম টাশ্রমের চাঁদা তোলার নাম করে নকল বিল বই নিয়ে লোক ঠকাতে পারবে? তাও পারবে না—কারণ তোমার অভিনয় করার ক্ষমতা নেই। একটাই রাস্তা তোমার কাছে খোলা আছে। তোমার বয়েস কম, চেহারাটাও মন্দ নয়—তুমি নিজেই

একটা কমোডিটি—এই কমোডিটি কেনার জন্য খদ্দের কলকাতায় অনেক আছে।

তাপসী অনুনয় করে বললো, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনাদের তো অনেক জায়গায় চেনাশুনো আছে—আমার দিদিকে কি পরিশ্রম করতে হয় আপনি জানেন না! দিদির টাকায় আমার পড়াশুনো চালাতে হবে, ভাবলেই আমার লজ্জা করে। আমি নিজে কিছু একটা না করলে—আপনি যদি আমাকে একটা যে-কোনো চাকরি—

সিগারেটের শেষ টুকরোটা জানলার বাইরে দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে গুপ্তদা উদাসীনভাবে বললেন, আমাকে যদি কোনো মহৎ লোক-টোক ভেবে থাকো, খুব ভুল করেছো। লোকের উপকার করার অভ্যেস আমার নেই। তা ছাড়া তোমার জন্যে কী-ই বা করতে পারি আমি? আমাদের অফিসে তোমার চাকরি পাবার কোনো চান্সই নেই—নিয়মকানুনের খুব কড়াকড়ি। অন্যান্য চেনাশুনো লোকদের কাছেও তোমার চাকরির জন্য উমেদারি করতে পারি না—কারণ তারা যদি জিজ্ঞেস করে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, তখন কি বলবো?

তাপসী মুখ নিচু করে বললো, বলবেন, একটি দুঃস্থ মেয়েকে সাহায্য করছেন। মানুষ কি মানুষের জন্য এটুকু করে না?

—দেশে তো তোমার মতন দুঃস্থ মেয়ে কম নেই! শুধু মেয়েই বা কেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ ছেলে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। তার মধ্যে থেকে শুধু তোমার জন্য আলাদা করে চেষ্টা করার কোনো কারণ আছে কি আমার পক্ষে?

উত্তর না দিয়ে তাপসী চুপ করে রইলো। এই লোকটির কথাবার্তার ধরণ সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কোনো মানুষই অন্যের দুঃখ বোঝে না! কেউ কি বুঝবে যে কতটা অসহায় অবস্থার জন্য তাকে বেপরোয়া হয়ে বাড়ির কারুকে কিছু না বলে থিয়েটার করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করতে হচ্ছে?

গুপ্তদা বললেন, আমি সারা জীবন বিয়ে করবো না, একেবারে ডিসাইড করে ফেলেছি। আগে আমি আমার দাদার সংসারে ছিলাম। তখন দেখেছি, বিবাহিত কি ঝামেলার ব্যাপার! ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাবার ঝঞ্ঝাট, অনেক দায়িত্ব, তার ওপর বৌয়ের সঙ্গে নিয়মিত

ঝগড়া—ওসব আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যারা পারে, তারা পারে। সুতরাং আমি তোমাকে বিয়ে করেও কোনো সাহায্য করতে পারছি না। নইলে, তোমার পক্ষে পট করে কারুর প্রেমে ট্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেলতে পারলে —বেঁচে যাওয়ার একটা রাস্তা ছিল।

—আমি বিয়ে করলে আমি হয়তো একা বাঁচতাম, কিন্তু তাতে আমাদের সংসারের কি সাহায্য হতো? আমার দিদি এই জন্যই তো কোনো ছেলের সঙ্গে কথাও বলে না। দিদি আমার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। দিদি যদি কারুকে বিয়ে করে চলে যেত—তা হলে আমাদের অবস্থা কি হতো?

—তা অবশ্য ঠিক। বিয়ে করার পর শ্বশুর বাড়ির সংসারের বোঝা টানতে কে চাইবে? যারা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম টেম করার জন্য ঘুর ঘুর করে, তারাও তোমার সংসারের অবস্থা শুনলে, বিয়ের নামটিও উচ্চারণ করবে না। তোমার এক ভাই আছে, সে কি করে?

তাপসীর চোখে তার ছোট ভাই রঞ্জুর চেহারাটা একবার ভেসে উঠলো। তার বয়েস ষোলো বছর, কিন্তু প্রায়ই সে রাত্তিরে বাড়ি ফেরে না। পড়াশুনো প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তাকে নিয়ে সব সময় একটা বিপদের আশংকা।

তাপসী আমতা আমতা করে বললো, সে স্কুলে পড়ে। গতবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছিল, পাশ করতে পারে নি।

—অর্থাৎ তার কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোনো আশা নেই এখন। বরং তার জন্যেই টাকা খরচ করতে হয় তোমাদের। দ্যাখো, সারা মাসে আমি আমার ফুর্তির জন্য যা টাকা খরচ করি—এই ধরো শ' পাঁচেক টাকা—তার অর্ধেকও যদি তোমাকে দিই, তোমাদের অনেক উপকার হয়। কিন্তু এমনি এমনি সেটা আমি তোমাকে দেব কেন বলো? কেউ দেয়?

তাপসী বললো, আপনি দিলেই বা আমি নেব কেন?

—ঠিক! সেটা ভিক্ষে নেওয়ার মতন হয়ে যায়। ভদ্র ভাষায় যাকে বলে দান। এক আনা দু' আনা দিলে সবাই বলে ভিক্ষে—আর একশো দুশো টাকা দিলে সেটাই হয়ে যায় দান, তাই না? খেতে পাও বা না পাও, সম্মানটি ঠিক রাখা চাই! ভিক্ষে কিংবা দান নেওয়া চলে না। আমিও দাতা কর্ণ নই। সুতরাং বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে যদি কিছু

পাই, তা হলে আমি তোমাকে এই টাকাটা দিতে পারি। যেমন ধরো, আমি শিগগিরই দীঘা যাচ্ছি বেড়াতে। দিন তিনেক থাকবো। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, ভালো হোটেলে থাকবে—সব খরচ-টরচ আমার—তা ছাড়াও তুমি আড়াই শো টাকা পাবে। রাজী ?

তাপসী শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললো, সে-রকমভাবে যদি আমাকে টাকা উপার্জন করতে হয়, তাহলে তার আগেই আমি আত্মহত্যা করবো।

গুপ্তদা উৎফুল্লভাবে বললেন, ঠিক বলেছো! আত্মহত্যা। এই আর একটা পথ খোলা আছে তোমার। সেটা তুমি তোমার নিজের ইনিসিয়েটিভেই অনায়াসে করতে পারো। বিয়ে কিংবা আত্মহত্যা এই দুটো পথই তোমার পক্ষে সহজ। অনেকদিন মেয়েদের আত্মহত্যা করার খবর শুনিনি। আমার অবশ্য ধারণা নকল সম্মান কিংবা সতীত্ব বাঁচাবার জন্য আত্মহত্যা করার কোনো মানে হয় না। নিছক বোকামি। বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। কি, বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা নয় ?

—আমি এসব কথার মানে জানি না।

—তুমি অসতী হলে লোকে তোমায় বড়জোর নিন্দে করবে। কিন্তু তুমি না খেয়ে থাকলে কেউ তোমাকে খেতে দেবে না। এমনকি সতীত্ব রক্ষার জন্য তুমি যদি আত্মহত্যা করো, এই সমাজ তোমার মূর্তি গড়িয়ে পুজো করবে না। তখনো সবাই বলবে, নিশ্চয়ই তোমার কোনো গণ্ডগোল ছিল।

—আমি এখন হাওড়া স্টেশনে যেতে পারি কি ?

—নিশ্চয়ই পারো। চলো, আমি তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসছি।

—আমাকে এখানেই ছেড়ে দিলে আমি বাসে করে চলে যেতে পারবো।

—না, না, আমি তোমাকে পেঁছে দেবো বলেছি—

গাড়ি আবার স্টার্ট দিলেন গুপ্তদা, ফেরালেন হাওড়ার দিকে। একটু-ক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। ব্রিজের কাছাকাছি এসে গুপ্তদা বললেন, তাপসী, তুমি মেয়েটা সত্যি খুব ভালো। তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। একটা ডিসেন্ট জীবন তোমার প্রাপ্য ছিল। কলেজে পড়ছো, এখন আনন্দ করার সময়, পড়াশুনোও করবে—তারপর পছন্দ মতন কারুকে

বিয়ে করবে—অনেক মেয়েই তো জীবনে এ সব পায়—অথচ তোমাকে পড়াশ্নো ছেড়ে অ্যামেচার থিয়েটার করে পয়সা রোজগার করতে আসতে হয়েছে। এত খেটেখ্টে আশী নব্বই টাকা পাবে। আমাদের দেশটা হতচ্ছাড়া, বিশ্রী এই সমাজ ব্যবস্থা—তোমাদের মতন মেয়েদের সাহায্য করার কেউ নেই। আমিও তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি জানি না !

—আপনাকে আমার জন্য কষ্ট করে আর ভাবতে হবে না।

—তুমি আমার ওপর রাগ করছো ? কিন্তু রাগ করা তোমার উচিত নয়। আমি সোজাসুজি খোলাখুলি কথা বলি। এ লাইনে যখন এসেছো, দেখবে অনেক ছেলে তোমার পেছনে ছোঁক ছোঁক করবে, অনেকে তোমাকে মিথ্যে প্রেমের কথা বলে ভোলাতে চাইবে—অনেকে জ্বালাবে—আমার কাছ থেকে সে সব কিছু পাবে না। আমি তোমাকে আর কক্ষনো বিরক্ত করবো না। তবে আমার স্টাণ্ডিং অফার দেওয়া রইলো। আমার সঙ্গে যদি কখনো দীঘায় যেতে রাজী থাকো—আড়াই শো টাকা রোজগার করতে পারবে। তোমার বেড়ানোও হবে—

—কথাটা শুনতেই আমার ঘেন্না করছে।

—ঠিক আছে, আর কখনো বলবো না।

—আমার দিদি যদি জানতে পারে যে আমি একজন অচেনা লোকের সঙ্গে গাড়ি করে ঘুরছি—

—তোমার দিদিকে তুমি খুব ভয় পাও ? কি নাম তোমার দিদির ?

—আমার দিদির নাম মানসী—

গুপ্তদা হাওড়া স্টেশনের কাছে গাড়ি থামিয়ে নামিয়ে দিলেন তাপসীকে। একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। আপন মনে বললেন, স্যাড, ভেরি স্যাড ! কিন্তু কি আর করা যাবে !

আট

অফিসে আজ পেন ডাউন স্ট্রাইক। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে আছে। কিন্তু কাজ বন্ধ। টিফিনের সময় ক্যান্টিনে বিক্ষোভ জানানো হবে।

মানসী বসে আছে মুখ শুকনো করে। অফিসে এসে কাজ না করলে ভালো লাগে না। কাজ না করলে সময় কাটে কি করে? অন্যরা আড্ডা দেয়, হুল্লোড় করে, কেউ কেউ গল্পের বই এনে ডেস্কের ওপর রেখে পড়ে—মানসীর ওসব একটুও পছন্দ হয় না। তার মনে সব সব সময় ভয়, যদি তার চাকরিটা চলে যায়। সে এখনো পার্মানেণ্ট হয়নি। অফিসে কাজ করতে গেলে ইউনিয়ানের কথা শুনতেই হবে। কিন্তু তার চাকরি চলে গেলে কি ইউনিয়ান তাকে বাঁচাতে পারবে?

মানসীর টেবিল থেকে একটু দূরেই বসে আরতি। মনোযোগ দিয়ে একটা উপন্যাস পড়ছিল। গত তিনদিন ধরেই সে ঐ মোটা বইটা পড়ছে। একটু বাদেই সেটা শেষ হয়ে গেল। বইটা হাতে নিয়ে উঠে এলো মানসীর কাছে, জিজ্ঞেস করলো, এই, তুই এটা পড়েছিস? কি দারুণ বই! এই রাইটারের বই আমার যা ভালো লাগে না!

মানসী বইটা নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলো। তারপর নিরুৎসুক ভাবে বললো, না পড়িনি।

আগে মানসীরও খুব বই পড়ার নেশা ছিল। রাত জেগে জেগে বই পড়তো। আজকাল আর সময় পায় না। তা ছাড়া, আজকাল এই সব বই পড়ে সে তেমন আনন্দও পায় না—পড়ার পর মনে হয়, সবাই বানিয়ে বানিয়ে মিষ্টি গল্প লিখেছে, সত্যিকারের জীবনের কথা কেউ লেখে না। শুধু মন দেওয়া নেওয়া ছাড়া আর কি কিছু নেই?

আরতি বললো, তুই পড়বি? নিতে পারিস। তবে সাবধানে রাখবি কিন্তু। একটা জায়গা আছে, সংযুক্তার সঙ্গে তার পুরোনো লাভারের দেখা হল অনেকদিন বাদে—সেখানে যা খোলাখুলি ভাবে লেখা আছে না, কান ফান গরম হয়ে যায় একেবারে! কবে ফেরৎ দিবি?

মানসী বললো, থাক আমি নেবো না। আমি পড়ার সময় পাবো না।

—সময় পাবি না? কি এমন রাজকার্য করিস?

মানসী হাসলো। আরতি বুঝবে না। অফিস থেকে বেরিয়েই মানসীকে ছুটতে হয় টিউশনি করতে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত্তির সাড়ে ন'টা পৌনে দশটা। তারপর বাড়ির সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হয় তাকে। এগারোটার আগে শোওয়া হয় না। সকালে উঠে তাকেই বাজারে যেতে হয়। ন'টা দশ-এ অফিসের ট্রেন। মানসীর সময় কোথায়?

এমন একটা রগরগে উপন্যাস পড়ার জন্যও মানসীর কোনো উৎসাহ নেই দেখে আরতি একটু অবাক হলো। আরতির চেহারা ভালো নয়, কোনো পুরুষ তাকে পাত্তা দেয় না—এই সব উপন্যাস পড়ে আরতি সান্ত্বনা ও তৃপ্তি পায়। সে আরও কিছুক্ষণ মানসীকে উপন্যাসটার গুণাগুণ বোঝাবার চেষ্টা করে নিরাশ হলো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, তুই আজ মিছিলে যাবি তো?

—কিসের মিছিল?

—তুই জানিস না?

—না তো।

আরতি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে, কেন, অমলবাবু তোকে বলেন নি কিছু? আমাকে তো বলে গেলেন!

আরতির হাসিটা গ্রাহ্য করলো না মানসী। বললো, না, আমাকে কেউ কিছু বলেনি। আজ আবার কিসের মিছিল?

—আজ ছুটির পর ময়দানে মিটিং আছে। মিছিল করে যেতে হবে?

—আমাদেরও যেতে হবে?

—সব্বাইকে। না হলে ছাড়বে নাকি ওরা!

তার পর আরতি গলা নিচু করে বললো, আমারও ভাই একদম ভালো লাগে না মিছিলে যেতে। রাস্তার লোকেরা এমন বিচ্ছিরি ভাবে তাকায়!

রাস্তার লোকে কিরকম ভাবে তাকায় সে নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই মানসীর। তার প্রধান অসুবিধে, মিছিলে গেলেই টিউশনিতে দেরী হয়ে

যাবে। একটু দেরী হলেই ছাত্রীর মা মুখ ভার করেন আজকাল। কিন্তু এসব কথা আরতিকে বলা যায় না। আরতির মনটা পরিষ্কার নয়, সে এখানে এক রকম কথা বলছে, আবার অন্য জায়গায় গিয়ে বলবে, মানসীর বড্ড দেমাক্। মিছিল টিছিল নাম শুনলেই মুখ কুঁচকোয়—

মানসী বললো, মিছিল যদি থাকে, তা হলে আমাদের তো যেতেই হবে। আমাদের সকলেরই তো ব্যাপার! মাইনে টাইনে বাড়লে সেটা তো আমরাও পাবো?

এই সময় বড় সাহেবের বেয়ারা মানসীর সামনে এসে বললো, আপনাকে সাহেব ডাকছেন!

অস্বাভাবিক কিছু নয়। অন্যদিন প্রায়ই মানসীর ডাক পড়ে—যেহেতু সে কাজ করে রেফারেন্স সেকশনে—ফাইল টাইলের খোঁজ করার জন্য তাকে ডাকতেই হয়। বড় সাহেব বেশ বুড়ো মানুষ, মেজাজটি কড়া। পুরুষ ও মেয়ে কর্মচারীদের মধ্যে তিনি কোনো প্রভেদ করেন না। গল্পে টল্পে যেমন থাকে—অফিসের বড় সাহেব মেয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে—মানসী সে রকম কোনোদিন দেখেনি।

বড় সাহেব ডাকলে তার যাবারই কথা। অথচ আজ যে পেন ডাউন স্ট্রাইক। কিন্তু বড় সাহেবের ডাক কি অগ্রাহ্য করা যায়? কিছু না ভেবেই মানসী উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নের দু'জন উৎসাহী ছেলে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? কি ব্যাপার?

মানসী মৃদু গলায় বললো, বড় সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন!

—না যেতে হবে না। আপনি চুপ করে বসে থাকুন!

—ডেকেছেন যখন, একবার গিয়ে শুনে আসি?

—না, যাবেন না। আপনাকে দিয়ে কাজ করাবে ভেতরে বসিয়ে। আজ আমরা পেন ডাউন স্ট্রাইক করেছি, ভালোভাবেই জানেন!

—কিন্তু ডাকলে না যাওয়াটা খারাপ দেখায় না?

ততক্ষণে অমল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। সব ব্যাপারটা শুনলো। তারপর বললো, ঠিক আছে, আমি ম্যানেজ করে দিচ্ছি।

অমল বড় সাহেবের বেয়ারাকে ডেকে বললো, তুমি গিয়ে সাহেবকে বলো, আজ বাবুরা কেউ কাজ করবেন না। দিদিমণিকে একা ডাকলে তিনি যেতে পারবেন না, অন্য বাবুরা রাগ করবেন।

মানসী আবার বসে পড়লো নিজের চেয়ারে। ছেলেরা দাঁড়িয়েই রইলো সেখানে। ওরা তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজছে। মানসীর এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার কোনো উৎসাহ নেই।

বড় সাহেবের বেয়ারা একটু বাদেই আবার ফিরে এলো। হাতে একটা ইংরেজি টাইপ করা নোট। তাতে লেখা আছে, আপনারা কাজ করবেন কি করবেন না, সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমি কাজ করছি এবং কাজের জন্য কাউকে দরকার হলে ডেকে পাঠাতে আমি বাধ্য। যাঁকে ডাকবো, তিনি যদি না আসতে চান—তবে সেকথা এই কাগজে লিখে দিন।

ব্যস, অফিসে একটা তুমুল কান্ড শুরু হয়ে গেল। সবাই ভিড় করে এলো মানসীর টেবিলের সামনে। চ্যাঁচামেচি, তর্কাতর্কি। কেউ বললো, কিছুতেই লিখিতভাবে কিছু দেওয়া হবে না। কেউ বললো, সবাই মিলে বড় সাহেবের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দেওয়া হোক, কেউ বললো, মানসীর উচিত বড় সাহেবের মুখের ওপর গিয়ে কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে আসা।

মানসী একটাও কথা বললো না, চুপ করে বসে রইলো চেয়ারে। তার মুখখানা বিষণ্ণ। এই ব্যাপারটা তাকে কেন্দ্র করেই বা হবে কেন? বড় সাহেব কি ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠাতে পারতেন না? সে এখনো পার্মানেন্ট হয়নি। তার ওপর দিয়েই যত ঝামেলা। সবই কি তার ভাগ্যের দোষ? তাকে কি শেষ পর্যন্ত ভাগ্য মানতে হবে?

এর পর থেকে অন্যরা তাকে যা বললো, সে যন্ত্রের মতন মেনে গেল। বড় সাহেবের ঘরে যে ডেপুটেশান গেল তাতেও যেতে হলো মানসীকে। টিফিনে সে অন্যদের সঙ্গে শ্লোগান দিল। পাঁচটার পর যোগ দিল মিছিলে। কারুর সঙ্গে একটিও অতিরিক্ত কথা বলে নি, কারুর কথায় প্রতিবাদও করেনি।

মিছিল ভাঙার পর মানসী একা একা হাঁটতে লাগলো হাওড়া স্টেশনের দিকে। আজ আর টিউশানিতে যাওয়া হবে না, তাড়াহুড়ো করে কোনো লাভ নেই। পরের ট্রেন সাতটা কুড়িতে। টিউশানিটা বোধহয় আর থাকবে না। চাকরিটা থাকবে তো? টিউশানির টাকায় তার ট্রেন ভাড়া আর অফিসের টিফিনের খরচ চলতো। সেটা না হয় ম্যানেজ করা যাবে —কিন্তু চাকরী গেলে?

এই মিছিল করে আর আন্দোলন চালিয়ে কি লাভ হয়? মাঝে মাঝে পাঁচ দশ টাকা মাইনে বাড়ে। ভিক্ষের মতন মনে হয়। মানসী বুঝতে পারে, এই গোটা সমাজ ব্যবস্থাটা না বদলালে তার মতন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অবস্থাও বদলাবে না কিছুই। এ কথাটা সে বুঝতে পারে আর অফিসের ঐ ছেলেগুলো বোঝে না? শুধু চ্যাঁচায়!

যাই হোক, আপাতত চাকরিটা বাঁচানোই সবচেয়ে বড় কথা মানসীর কাছে। একটা চাকরি এখন ভগবানের চেয়েও শক্তিশালী জিনিস। একটি ডাক্তারখানার সামনে মানসী থমকে দাঁড়ালো। এখান থেকে বড় সাহেবকে টেলিফোন করবে? অফিসের পাশেই বড় সাহেবের কোয়ার্টার। বড় সাহেবকে টেলিফোন করে বলবে, স্যার, আমার কোনো দোষ নেই। আপনি ডাকার পর আমি যেতে চেয়েছিলাম। অন্যরা আমাকে যেতে দেয়নি। আমি একলা মেয়ে হয়ে কি অতগুলো লোকের বিরুদ্ধে যেতে পারি? আমার কোনো দোষ নেই। দয়া করে আমার চাকরিটা খাবেন না। সামনের মাসে আমার পার্মানেণ্ট হবার কথা—

—কি ব্যাপার এখানে কি করছেন?

মানসী চমকে পাশে তাকালো। অমলকে দেখতে পেয়ে তার মুখখানা কঠিন হয়ে গেল। আর টেলিফোন করা হবে না এখন!

অমল হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে? অন্যদিন তো অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরতে ছোটেন?

—আজ আমার ট্রেন দেরীতে।

—ওঃ, তাহলে তো ভালোই হলো! হাতে সময় আছে যখন চলুন কোথাও বসা যাক্!

মানসী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো অমলের দিকে। তারপর বললো, আপনিই বা হঠাৎ এখানে কি করে এলেন? আপনি আজও আমার পেছন পেছন আসছিলেন?

অমল নির্লজ্জের মতন হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ।

—কেন?

—সেটা কি এখানেই দাঁড়িয়েই বলতে হবে।

—হ্যাঁ।

—কোনো দোকান টোকানে বসে ধীরে সুস্থে বললে হতো না?

—আপনি ভালোভাবেই জানেন, আপনার সঙ্গে আমি কোথ্থাও যাবো না। তবু কেন আমাকে রোজ রোজ বিরক্ত করতে আসেন?

—আপনি বিরক্ত হচ্ছেন?

—নিশ্চয়ই!

—আপনি বিরক্ত হলেও আমার না এসে উপায় নেই। আপনাকে আমি ভালোবাসি।

কাথাটা বলেই অমল এদিক ওদিক তাকালো। যদিও ডালহৌসি স্কোয়ারের পেছন দিকের এই রাস্তাটা অনেকটা নির্জন, তবু এই রকম রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভালোবাসা কথাটা উচ্চারণ করলে কী রকম যেন অদ্ভুত শোনায়।

মুখ ফিরিয়ে অমল দুর্বল ভাবে বললো আমি কথাটা ঠিক এই ভাবে বলতে চাইনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কথাটা সত্যি।

মানসীর মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সেইরকম অমলের চোখের দিকে চোখ রেখেই বললো, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি নিয়ে বিলাসিতা করার মতন সময় আপনাদের থাকতে পারে, আমার একদম নেই।

—এটা কি বিলাসিতার ব্যাপার হলো?

—আমার কাছে অন্তত তাই।

—আমার কাছে কিন্তু এটা জীবন মরণের ব্যাপার।

মানসীর বুকের মধ্যে অনেক রাগ দুঃখ জমা ছিল। তবু সে হেসে ফেললো। অমল নামের এই ছেলেটি মানসীর পাঁচ ছ বছরের বড়ই হবে, তবু মানসীর ওকে মনে হলো খুব ছেলেমানুষ। ভালোবাসা টাসার ওপর কি মানুষের জীবন মরণ নির্ভর করে? জীবন মরণ নির্ভর করে খেতে পাওয়া কি না-পাওয়ার ওপর।

অমলের সঙ্গে এই সম্পর্কে কথা বলার একটুও ইচ্ছে ছিল না মানসীর। কিন্তু দিনের পর দিন এই ছেলেটা তার পেছনে ঘুরে জ্বালাতন করছে। একই অফিসে চাকরি করে— খুব একটা কঠোর ব্যবহারও করা যায় না। তা হলে হয়তো মানসীর চাকরী করাই দায় হয়ে উঠবে। ছেলেরা ইচ্ছে করলে মেয়েদের জীবন অতিষ্ঠ করে দিতে পারে। কিন্তু এর একটা কিছু হেস্তনেস্তও হওয়া দরকার।

মানসী হাঁটতে লাগলো আস্তে আস্তে। অমল তার পাশে পাশে। মানসী জিজ্ঞেস করলো, আপনি হঠাৎ আমাকে ভালোবেসে ফেললেন কেন?

—এ সব কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলোচনা না করে কোথাও বসে বললে হতো না?

—না, খুব বেশী আলোচনা করারও তো নেই। আমি যেতে যেতে শুনবো।

—আপনি কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো? সে কেন'র কোনো উত্তর নেই। ভলেবাসা কি যুক্তি মেনে চলে?

—এটা বই পড়া কথা মনে হচ্ছে!

—বইতে কি সব সময় মিথ্যে কথা লেখা থাকে? সত্যি কথাও তো থাকে। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা। কোনো বইয়ের সঙ্গে মিলে গেলেও যেতে পারে।

—আচ্ছা, আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ধরুন আমি যদি ওই অফিসে কাজ না করতাম, তা হলে আপনার সঙ্গে আমার কখনো চেনা শুনো হতো না—হয়তো জীবনে কখনো দেখাই হতো না, সুতরাং আমাকে ভালোবাসার কোনো প্রশ্নই উঠতো না। অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হতো, তাকেই হয়তো ভালোবাসতেন--তখন সেটাই আপনার কাছে মনে হতো জীবন মরণের প্রশ্ন। তাই হতো না?

—আপনি আমাকে এরকমভাবে জেরা করছেন কেন?

—জেরা করছি? তা নয়। আমি বোঝাতে চাইছি, আপনি আমার বদলে অন্য কোনো মেয়েকেও স্বচ্ছন্দে ভালোবাসতে পারতেন। এখনো পারেন।

অমল মানসীর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো, এবারে আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—করুন।

—সত্যি উত্তর দেবেন?

—হ্যাঁ, দেবো না কেন?

—আচ্ছা, আমি যে আপনাকে ভালোবাসার কথা বললাম—মানে, ঠিক এই রকমভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতে চাইনি অবশ্য—তবু বলে ফেললাম,

সেটা শুনে আপনার মনের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই হয়নি? আমি কি এতই হেলাফেলার যোগ্য? আপনি কি আমাকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করছেন না? একজন পুরুষ যখন একটি মেয়েকে একথা বলে—

মানসী বুঝতে পারলো অমল সত্যিই মনে খানিকটা আঘাত পেয়েছে। কিন্তু সে তো কারুকে দুঃখ বা আঘাত দিতে চায় না। কেউ যদি সাধ করে আঘাত পেতে আসে, সে কি বরবে?

একটু নরম গলায় মানসী বললো, দেখুন, আমার নিজের জীবনের যা সমস্যা, তাতে এ সব ব্যাপার নিয়ে সত্যি আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই।

—আপনার সমস্যাটা কি আমি কি জানতে পারি?

—আপনার মাথার মধ্যে শুধু প্রেম ভালোবাসা গিজগিজ করছে। আপনি তো আমার আর কিছু জানতে চান নি কখনো। আপনি কতটুকু চেনেন? কিছুই না। তবু আমাকে দুম করে ভালোবেসে ফেললেন!

—আমার দোষ হয়ে গেছে। আপনার সমস্যাটা কি এখন শুনতে পারি না?

—শুনে আপনার লাভ নেই। আমার সমস্যাটা হচ্ছে বেঁচে থাকার সমস্যা। আমাদের বাড়িতে কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই। আমার বাবা অসুখে ভুগে নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেছেন। আমার মা আছেন বাড়িতে, তিনটি ছোট ভাইবোন। তার মধ্যে আমার ভাইটি গুণ্ডামি বখামি করে বেড়ায়। তাকে নিয়ে সব সময় দুশ্চিন্তা। আমার এক বোন কলেজে পড়ে—আমি চাই তাকে যেন কোনো কষ্ট করতে না হয়, সে যেন ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারে—আর এক বোন ইস্কুলে পড়ে—সে পড়াশুনোয় ভালো—এইসব খরচ চালাতে হয় আমাকে। এজন্য আমাকে কি পরিশ্রম করতে হয়, তা আপনি বুঝবেন না। অন্য কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই পাই না আমি। প্রেম ভালোবাসার কথা টথা সত্যিই আমার কাছে বিলাসিতা মনে হয়।

একটু চুপ করে থেকে মানসী আবার বললো, এসব অভাব-অভিযোগের কথা অন্যকে জানাবার কোনো মানে হয় না। কোনো মেয়ের মুখ থেকে এসব কথা আরও মানায় না। আমিও আপনাকে বলতে চাইনি—হঠাৎ বলে ফেললাম।

অমল অপরাধীর মতন মুখ করে বললো, সত্যি, এসব আমার আগেই জানার চেষ্টা করা উচিত ছিল।

—আপনারা মানুষ সম্পর্কে কিছুই জানার চেষ্টা করেন না। অথচ ইউনিয়ন করেন, মিছিল করেন। জানেন, আজকে মিছিলে যাওয়ার জন্য আমার টিউশানি যাওয়া হলো না—এর ফলে টিউশানিটা হারাতে হতে পারে! কিংবা, আমার চাকরিটাও যদি চলে যায়? ওটা যদি চলে যায় —তা হলে আমার যা অসুবিধে হবে—

—আমি যদি আপনার অসুবিধের কিছু ভাগ নিতে চাই?

—তার মানে?

—মানে, ইয়ে, বলছিলাম কি, আমি একজন নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ—সংসারে আমার কেউ নেই—আমি যদি আপনার জীবনের এই সব সমস্যার ভাগ নিতে চাই।

—আপনি আমার এইসব সমস্যার বোঝা কাঁধে নেবেন কেন?

হাঁটতে হাঁটতে ওরা স্ট্র্যান্ড রোডে এসে পড়েছে। অদূরেই হাওড়া ব্রিজ। রাস্তায় অনেক মানুষ, তবে কেউ কারুর দিকে মনোযোগ দেবার সময় পায় না। অনেকেরই ট্রেন ধরার ব্যস্ততা।

অমলকে এবার খুব একটা কঠিন কথা উচ্চারণ করতে হবে। সেই জন্যই সে চেষ্টা করে সপ্রতিভ হয়ে উঠলো। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো মানে, আমি যদি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, আপনি কি অনুমতি দেবেন? তারপর দু'জনে এক সঙ্গে—

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অমলের মনে হলো, পৃথিবীতে এর আগে কখনো কোনো পুরুষ এইরকম ভিড়ে ভর্তি রাস্তায় কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব করে নি।

মানসীর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। খর চোখে তাকালো অমলের দিকে। তার মুখের প্রতিটি রেখা থেকে কি যেন পড়ে নিতে চাইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, তা হয় না। আমি কেন আপনাকে এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াবো!

—আমি যদি এটাকে ঝঞ্ঝাট বলে মনে না করি?

—না, তা হয় না।

—নিশ্চয়ই হবে। তুমি যতদিন না রাজী হবে—ততদিন আমি

তোমাকে বিরক্ত করবো। দেখি, কতদিন তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারো!

আর

মানসীর টিউশানিটা সত্যিই গেছে। এক-আধ দিন কামাই করার জন্য নয়, অন্য কারণে। ছাত্রী দু'জনের ছোকরা দাদা ইদানীং মানসীর সঙ্গে বেশীক্ষণ গল্প করা শুরু করেছিল। ফুটবল খেলা ও ছাত্র রাজনীতি সেরে সে ন'টা আন্দাজ বাড়ি ফিরেই মানসীর সামনে গ্যাঁট হয়ে বসতো। মানসী তখন পড়া শেষ করে উঠে আসতে চাইলেও নিষ্কৃতি নেই—সে তখন মানসীকে এগিয়ে দিতে চায় রাস্তা পর্যন্ত।

ছাত্রীদের মা এটা মোটেই পছন্দ করলেন না। ইদানীং তাঁর স্বামী প্রায়ই বাড়ি ফেরেন না বলে তিনি অত্যন্ত বেশী খিটখিটে হয়ে গেছেন। মাসের মাঝখানেই হঠাৎ তিনি একদিন মানসীকে ছাড়িয়ে দিলেন। এরকমও ইঙ্গিত করলেন যে, মানসীই নাকি ছলাকলা বিস্তার করে তাঁর ছেলের মাথা খাবার চেষ্টা করছিল।

মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এসব ব্যাপার নিয়ে তর্ক করা যায় না, ঝগড়া করা যায় না। কিছু বলতে গেলেই ব্যাপার অনেক দূর গড়াতে পারে। তিক্ত, অপমানিত মন নিয়ে মানসী সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

অফিস থেকে বেরিয়েই এখন আর মানসীর চুঁচড়োয় ফেরার তাড়া নেই। তবু সে তাড়াতাড়ি ফেরে। আগে সে এখানকার একটা মেয়েদের স্কুলে বছর খানেক কাজ করেছিল, সেই স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে যায়। যদি নতুন কোনো টিউশানির সন্ধান মেলে।

বাড়ি ফিরে হিমানীকে নিয়ে পড়তে বসায়। হিমানী পড়াশুনোয় এমনিতেই ভালো, তবু মানসী ভাবে, যদি হিমানী কোনোক্রমে একটা স্কলারশীপ পায়, তা হলে তার কলেজে পড়ার পথ সুগম হবে। দিন দিন যা অবস্থা হচ্ছে, এমনিতে কি হিমানীকে আর পড়াশুনো করানো সম্ভব হবে?

হিমানী পড়ছেও প্রাণপণ করে। এই মেয়েটার কোনো বন্ধু নেই, কারুর সঙ্গে খেলতে যায় না—বাড়িতে যতক্ষণ থাকে—শুধু বই পড়াই তার ধ্যান জ্ঞান। অথচ এই বয়সের মেয়ে, কত ছটফটে হবার কথা ছিল।

দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে হিমানী। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে। আগে মুখখানি ঢলঢলে ছিল, এখন শুকনো দেখায়। তার পেট ব্যথার অসুখের কথা সে কাউকে বলে না। ওকে দেখে মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় মানসীর। বাবার কত আদরের মেয়ে ছিল, এখন ওর কিছুই যত্ন হয় না। আর কটা বছর যাক্, তারপর লেখাপড়া শিখে যদি মেয়েটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে!

তাপসী প্রায়ই দেরী করে ফেরে। সেটা লক্ষ্য করেছে মানসী, তবু কিছু বলে না! হঠাৎ সে সচেতন হয়েছে, ইদানীং বাড়িতে ফিরে ভাই-বোনেদের বকাবকিই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এরকম বেশী দিন চললে, সবার চোখে সে একটা ভীতিজনক চরিত্র হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া, তার টাকায় সংসার চলছে বলেই কি সে সকলকে শাসন করার অধিকার পেয়েছে? মা যদি তার ছেলেমেয়েদের সামলাতে না পারে—সে কি করবে?

বাড়িতে ফিরেই খুব সাড়ম্বরে পড়তে বসে যায় তাপসী। পড়া-শুনোর অজুহাতে রাত জাগে। কিন্তু মানসী জানে, পড়াশুনোয় তেমন মাথা নেই তাপসীর। কোনোক্রমে পাশটা করতে পারলেই হয়। তাপসী একটু সাজতে গুজতে, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসে। এই বয়েসে যদি বন্ধুদের সঙ্গে মিশে একটু দেরী করে বাড়ি ফেরে—তা হলে খুব দোষ দেওয়া যায় না! এবার আস্তে আস্তে ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যত কম করেই করা যাক্, তবু তো কিছু টাকা লাগবে! তাপসীকে তো দেখতে ভালোই, ওকে দেখে এমনিই যদি কারুর পছন্দ হয়ে যায়—তা হলে বেশ হয়। কিন্তু, আর একটা কথা ভেবেও মানসীর বুকের মধ্যে ছমছম করে। তাপসী যদি কোনো খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে? ওর কী-ই বা বয়েস, ওর কি মানুষ চেনার ক্ষমতা আছে? ইদানীং প্রায়ই গান গাইতে বসছে তাপসী—কি রকম যেন সন্দেহ হয়।

অমল একেবারে নাছোড়বান্দা—কিছুতেই মানসীকে নিস্কৃতি দেবে

না। তবে একটা কথা মানসী বুঝেছে, ছেলেটা খারাপ নয়। কোনো কু-মতলব ওর নেই। অন্তঃকরণটা পরিষ্কার। ওর এই ভালোত্বই মানসীকে আস্তে আস্তে দুর্বল করে দিচ্ছে! অথচ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবারও কোনো মানে হয় না।

রঞ্জুর সঙ্গে দেখাই হয় না প্রায়। বাড়িতে সে একবার করে আসে ঠিকই—কিন্তু তখন মা ছাড়া আর কেউ থাকেন না। এরই মধ্যে কি একটা ছুটির দিন ছিল, রঞ্জুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মানসীর। দুপুরবেলা।

দিদিকে দেখেই রঞ্জু আবার বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, মানসী ডাকলো, এই শুনে যা, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

রঞ্জু মুখ গোঁজ করে দাঁড়ালো, কোনো কথা বললো না।

মানসী বেশ নরম ভাবেই বললো, শোন, তুই যা করতে চাস, তাতে আমরা কেউ বাধা দেবো না। কিন্তু কি করছিস, সেটা তো অন্তত আমাকে বলতে পারিস!

—কি আবার করছি? কিছুই করছি না তো!

—তা হলে সারাদিন থাকিস কোথায়?

—নানান্ জায়গায়।

—তা হলে আর পড়াশুনো করবি না ঠিক করেছিস?

—আমার আর ইস্কুলে যেতে ভালো লাগে না।

—তা হলে কি করবি ঠিক করেছিস?

—দেখা যাক্!

মানসী চুপ করে ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইলো। এর পর আর কি বলা যায় সে ভেবে পেল না। ছোটবেলা থেকেই ও কারুর কথা শোনে না—এখন তো আরও শুনবে না। কিন্তু এইটুকু ছেলে—এ যা খুশি তাই করবে, এ কি সহ্য করা যায়?

হঠাৎ মানসীর খুব রাগ হয়ে গেল। ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, আমি দীপকদার সঙ্গে আজই দেখা করবো।

—কেন, দীপকদার সঙ্গে তোমার কি দরকার?

—আমি জিজ্ঞেস করবো, উনি ভেবেছেন কি? ছোট ছোট ছেলেদের ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে কি করতে চান তিনি।

রঞ্জু নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল দীপকদার দেখা পাবে না। তার সময় নেই।

একটু থেমে আবার বললো, তোমরা আমার ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামালেই পারো! তোমরা নিজেদের চরকায় তেল দাও না।

মা বেরিয়ে এসেছিলেন। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, কি হয়েছে রে?

রঞ্জু আর দাঁড়ালো না, বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। মানসী মায়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো, ও বলে গেল, ওর কথা নিয়ে আমরা যেন মাথা না ঘামাই। অথচ আমাদের মাথা ঘামাতেই হবে! ও আমাদের ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা কি তা পারবো?

মা বললেন, আমারই হয়েছে যত জ্বালা। ভগবান আমাকে নেয় না কেন? আমি আর পারি না, সত্যি পারি না!

মানসী বুঝলো, এবারে কান্নাকাটি শুরু হবে। তাড়াতাড়ি চলে গেল নিজের ঘরে

এইরকমভাবে দিন যায়। যদিও প্রত্যেকটা দিনই এরকম তিক্ততার স্বাদে শেষ হয় না। এরই মধ্যে কোনো একটা দিন অন্যরকম। সেদিন রঞ্জু সারাদিন বাড়ি থাকে—বাথরুমের আলোর প্লাগটা বেশ কিছুদিন খারাপ হয়ে গেছে—সেটা রঞ্জু নিজেই সারায়। তাপসী সেদিন বাড়ি থেকে একেবারেই না বেরিয়ে মা কে রান্না-বান্নায় সাহায্য করে। হিমানীর সেদিন পেট ব্যথা করে না। মানসী অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখে যে বাড়িতে বেশ একটা ঝলমলে খুশীর আবহাওয়া। সেদিন সবাই একসঙ্গে খেতে বসে অনেক গল্প করে। দুঃখ-দারিদ্রের ছায়া মাথার ওপর ভেসে বেড়ায় না।

খাবার মাঝখানে হিমানী হঠাৎ বলে, এই দিদি, হিরন্ময়দা'র গান! রেডিওটা নিয়ে আসছি।

খাওয়া থামিয়ে সবাই হিরন্ময়ের গান শোনে। বেশ ভালো গাইছে আজকাল হিরন্ময়—যথেষ্ট নামও হয়েছে। এই হিরন্ময় এক সময় এ বাড়িতে খুব আসতো, মানসীকে গান শেখাতো—অনেকটা বাড়ির ছেলের মতন হয়ে গিয়েছিল। ওদেরই চেনা একজন মানুষ রেডিওতে গান গাইছে, এত বিখ্যাত হয়ে গেছে—এ জন্য ওদের একটু একটু গর্বও হয়।

মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, হিরন্ময়রা এখন কোথায় থাকে? কেমন আছে ওর বউ! বাচ্চা-টাচ্চা হয়েছে?

প্রশ্নগুলো মানসীকে উদ্দেশ্য করেই, তবু উত্তর দিতে সে লজ্জা পেল। আলগা ভাবে বললো, কি জানি, অনেক দিন দেখা হয় না!

সেই সব রাত্তিরে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে খুব হিরন্ময়দা'র কথা মনে পড়ে মানসীর। এখন আর মন কেমন করে না। বরং হিরন্ময়দার কথা ভাবলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। এক সময় সে পাগলের মতন ভালোবেসেছিল হিরন্ময়দাকে, সে চাইলে মানসী সব কিছু দিতে পারতো—কিন্তু কিছুই নেয়নি সে, বরং মানসীকে বাঁচিয়েছে।

হিরন্ময়দার সেই কথাটাও বার বার মনে পড়ে মানসীর। জীবনে একটা কিছু করা উচিত, শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই সব নয়। যে মানুষ যে অবস্থায় আছে, তাকে তার থেকে আরও উপরে উঠতে হবে। কিন্তু মানসী সেই উত্তরণের পথ দেখতে পায় না।

দশ

হাওড়া স্টেশনে সাংঘাতিক ট্রাফিক জ্যাম। আধ ঘন্টা ধরে ট্রাম-বাস-গাড়িগুলো অনড় হয়ে আছে। ট্রেন মিস করার ভয়ে মানসী আর অমল বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল।

মানসী বললো, তোমাকে আর আসতে হবে না। তুমি এবার যাও!

অমল বললো, চলনা, তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি!

—শুধু শুধু কেন এতটা যাবে? তোমার ফেরার বাস পেতে অসুবিধে হবে।

—হোক একটু অসুবিধে।

হাওড়া স্টেশন লোকে লোকারণ্য। ঘণ্টা দু-এক ধরে কোন ট্রেন ছাড়েনি, কাছেই যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে। শিগগিরই ট্রেন চলবে—এরকম শোনা যাচ্ছে বটে, কিন্তু নাও চলতে পারে একথাটাও শোনা যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে।

মানসীর মুখ শুকিয়ে গেল। এমনিতেই তার অনেক দেরী হয়ে গেছে। এরপর বাড়ি ফিরতে আরও কতক্ষণ লাগবে কে জানে! টিউশানিতে যাওয়া তো আজ হলই না। অমল যেতে দিল না কিছুতেই। মানসী নতুন আর একটা টিউশানি জোগাড় করেছিল, অমল চায়না সে আর টিউশানি করুক।

ট্রেন চলছে না বলে অমলের মুখখানা কিন্তু খুশিতে উচ্ছল। সে বলল, আজ যদি সারারাত ট্রেন না চলে তাহলে খুব ভাল হয়।

মানসী বলল, ওমা, ট্রেন না চললে আমি বাড়ি যাব কি করে!

অমল অম্লানবদনে বলল, বাড়ি যাবে না!

—বাঃ, বাড়ি যাব না ত কোথায় যাব?

—দুজনেই এই প্ল্যাটফর্মে বসে থাকব। মন্দ কি!

—কি রকম মশা এখানে তা জান? সারারাত থাকলে মশা একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলবে!

অমল চিন্তিত ভাবে বলল, তাহলে কোথায় থাকা যায়? আমাদের মেসে তো মেয়েদের ঢুকতে দেবার নিয়ম নেই। তাহলে কোন হোটেলে টোটেলে—কিন্তু তোমার সিঁদুর নেই—এক সঙ্গে কি থাকতে দেবে?

—এই অসভ্যের মতন কথা বল না!

—তাহলে চল, সারারাত ঘুরে বেড়ান যাক্!

—আমি সারারাত বাড়ি না ফিরলে কি হবে জানো? আমার মা অজ্ঞান হয়ে যাবেন। আমার বোনেরা থানায় হাসপাতালে ছোটাছুটি করবে। সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। আমার একেবারে রুটিন বাঁধা জীবন। কোন কিছুই ওলোট-পালোট হবার উপায় নেই।

—এই রুটিন বদলে যাবে, যখন আমরা দুজনেই একসঙ্গে এক ট্রেনে বাড়ি ফিরব।

মানসী চুপ করে গেল। মুখ ফেরাল অন্যদিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, দুঃখের নয়, আনন্দের।

অমল বললো, চুপ করে রইলে যে? আজই বলবে তো?

—হাঁ বলব।

—তোমার মা কি আপত্তি করবেন?

—মনে তো হয় না! মা সাধারণত আমার কোন কথায় আপত্তি করেন না।

—আমাকে তোমার মায়ের খুব অপছন্দ হবার কথা নয়। তুমি যেদিনই বলবে, সেদিনই আমি দেখা করব। আশাকরি জাতটাতের ব্যাপারে তোমাদের বাড়িতে গোড়ামি নেই? আমি আবার ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণদের কেউ আজকাল পছন্দ করে না!

—ব্রাহ্মণ বলেই তো ঘর জামাই হয়ে থাকতে চাইছ।

—ভাবতেই আমার একসাইটিং লাগছে।

—এই, সত্যি করে বল তো, ঘর জামাই হয়ে থাকতে তোমার লজ্জা করবে না?

—লজ্জার কি আছে? এ ত দারুণ আরামের ব্যাপার। আমি এক একটা হুকুম করব— আর আমার শ্যালিকারা সেটা পালন করবে।

—লোকে যদি তোমায় নিন্দে করে?

—তাতে আমার বয়েই যাবে! তাছাড়া লোকেরও আজকাল অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন এতো সময় নেই! কিন্তু শোন মানসী, তোমার মনের মধ্যে কোন খুঁতখুতুনি নেই তো? যদি আপত্তি থাকে—

—আমার? না, না, আমার কি আপত্তি থাকবে?

—তা হলে এটাই তো সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। আমার বাবা মা মারা গেছেন অনেকদিন আগে। বহুকাল আমি সাংসারিক জীবনের স্বাদ পাইনি। মেসে হোস্টেলেই কেটে গেল এতখানি জীবন। তোমাদের সংসারে আমি যদি জায়গা পাই, আমার পক্ষে ত খুবই ভাল। তোমার মায়ের হাতের রান্না নিরামিষ সুক্তো টুক্তো খাব—কতদিন ওসব খাইনি। আর, তোমাদের দিক থেকেও দেখ, তোমাদের সংসারে কোন পুরুষ মানুষ নেই সেরকম। আমি থাকলে তোমাদের পক্ষে সুবিধেই হবে। বিয়ের পর তোমার পক্ষে অন্য বাড়িতে চলে যাওয়াও ত এখন সম্ভব নয়। নাকি সেটা সম্ভব?

—না অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব।

তাহলে এটাই কি সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা নয়? তোমার বাড়ির কথা ভেবে তোমার জীবনটা নষ্ট করবে, তারও কোন মানে হয় না! আমাকেও একটু ভাবতে দাও না!

মানসী কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল অমলের দিকে। এই মানুষকে সে ভুল ভেবেছিল কি করে?

অমল বললো, কি রাজী?

—হ্যাঁ, রাজী।

—ইস্, অফিসের ছেলেদের সঙ্গে যদি সত্যি বাজী ফেলতাম তাহলে কত টাকা যে জিতে যেতাম!

—বাজি ফেলনি কেন?

—নিজের কাছে তো জিতে গেছি! শোন, তোমার মাকে আজই বলছ তো? আমার আর দেরী সইছে না।

—হ্যাঁ, আজ রাত্তিরেই ফিরে গিয়ে বলব।

তারপর একটু থেমে, অমলের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভারী মধুর ভাবে হেসে মানসী বলল, আমারও আর দেরী করতে ইচ্ছে করছে না!

লোকজনের মধ্যে একটা সোরগোল শোনা গেল। ট্রেন আবার চলবে এক্ষুনি। ওরা দুজনেই এগিয়ে গেল গেটের দিকে। মানসীর কানের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে অমল ফিসফিস করে বললো আমিও চলে যাব নাকি তোমার সঙ্গে?

—ধ্যাৎ!

—যাই না! বেশ চমকে দেওয়া যাবে তোমার মাকে।

পাগলামী করো না। আর কয়েকটা দিন ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারছ না।

—আজই তোমার মাকে বলে ফেল কিন্তু।

মানসী যখন গেট পার হতে যাবে, তখন তার হাত ধরে আবার টেনে এনে অমল হাসি মুখে বলল, শোন, আর একটা কথা বলে দিচ্ছি। তোমার ঐ হিরণ্ময়দার সঙ্গে আর বেশি দেখা করতে পারবে না!

মানসী হাসতে হাসতে বললো, ঠিক আছে, তোমাকে একদিন হিরণ্ময়দার বাড়িতে নিয়ে যাব। তখন দেখবে, কি রকম মানুষ!

নাটকের অভিনয় শেষ হয়েছে রাত নটা পঁচিশে, মেকআপ তুলতে তুলতে আরও মিনিট পনেরো কুড়ি লাগল। তাপসী অনবরত তাড়া-

হয়তো করছে। বাড়ি ফিরতে এগারটা তো বাজবেই! ইস্ এত দেরী করে সে কোনদিন বাড়ি ফেরেনি! বাড়ির সবাই কি যে ভাববে আজ!

রিহার্সাল দিয়ে ফিরতে ফিরতে এর আগে দু'একদিন নটা সাড়ে নটা বেজে গেছে। তাতেই মা আর দিদির মুখ গম্ভীর। দিদি বাড়ি ফেরার পর ফিরলেই সবচেয়ে ঝামেলা। দিদি কিংবা মা অবশ্য এতদিন শুধু গম্ভীরই থাকছে, কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। তাপসীও ঠিক করেছে, ওরা জিজ্ঞেস না করলে সে কিছু কৈফিয়ৎ দেবে না।

তাপসীর বুক ঢিপ ঢিপ করছে এখনও। জীবনে এই প্রথম সে স্টেজে নামল—তাও প্রায় হাজার খানেক লোকের সামনে। খালি মনে হচ্ছিল পার্ট ভুলে যাবে। পা কাঁপছিল থরথর করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালভাবেই উতরে গেল। গানটাও মোটামুটি খারাপ হয় নি। হাততালি পেয়েছে দুবার। নাটক—অভিনয়ে হাততালি পাওয়াই নাকি দারুণ কৃতিত্বের কথা। ডিরেকটার তো উৎসাহের চোটে পিঠ চাপড়েই দিলেন তাপসীর।

তাপসীর আনন্দও হচ্ছে খুব। সার্থকতার আনন্দ। এ কদিন রিহার্সাল দিয়ে ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু আজ স্টেজে আসল অভিনয়ে টের পেল, এ সবের উত্তেজনা কতখানি।

সবাই এখন থিয়েটারের গল্পে মেতে আছে। তাপসী যোগ দিতে পারছে না। তার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ বাড়ি ফেরার চিন্তা। অথচ অন্যদের কোন গরজ নেই। সবারই ঢিলেঢালা ভাব। বারবার ডেকে ডেকে ছবি তোলা হচ্ছে। এরপর আবার খাওয়া দাওয়া হবে।

মল্লিকা বলল, কিরে তাপসী, তুই এখানে মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? তোর তো বেশ ভাল হয়েছে রে। সবাই খুব প্রশংসা করছে।

তৃষ্ণার্তের মত তাপসীর ইচ্ছে হল সেই সব প্রশংসার কথা আরও শুনতে। কিন্তু নিজেকে দমন করে বলল, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আমার লাস্ট ট্রেন চলে যাবে!

—যায় যাবে! আমার ওখানে শুয়ে থাকবি!

—ওরে বাবা! অসম্ভব! আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে।

—তুই রাখত! অত বাড়ি বাড়ি করলে এ লাইনে কিছু সুবিধে করতে পারবি না।

—না সত্যি বলছি, মল্লিকাদি, বাড়ি না ফিরলে—

পাশ থেকে একজন বলল, আপনি কি করে বাড়ি যাবেন ? এত রাতে কি বাস পাবেন হাওড়া থেকে ?

—বাসে না, আমি ট্রেনে যাব।

—হাওড়ার সব ট্রেন তো আজ বন্ধ !

—অ্যাঁ ?

তাপসীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ফ্যাকাসে গলায় বলল, যাঃ, বাজে কথা। হাওড়ার ট্রেন কখনো বন্ধ হয় না।

—হ্যাঁ, সত্যি বন্ধ ! দু তিন জনের মুখে শুনলাম।

তাপসীর বুক ধড়াস ধড়াস করছে। কথাটা ঠাট্টা না সত্যি বুঝতে পারছে না। সে যদি আজ বাড়িতে না ফিরতে পারে, কি হবে ? তার কোন কৈফিয়ৎ কেউ কাল বিশ্বাস করবে ?

ক্লাবের সেক্রেটারি পাশ থেকে শুনতে পেয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনার চিন্তা নেই। আমাদের অফিসের গাড়ি আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে আসবে। হাওড়ার দিকে যাবেই। আপনি উত্তরপাড়ায় থাকেন তো ?

—না, আমি চুঁচড়োয় থাকি !

—ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নেই। চুঁচড়ো পর্যন্তই যাবে !

মল্লিকা বলে উঠল, ইস্, ওর বেলায় অফিসের গাড়ি চুঁচড়ো পর্যন্ত যেতে পারে ! আর আমাদের কেউ বাড়ি পেঁৗছে দেয় না।

স্টেশন ওয়াগন চেপে খানিকটা দূরে এসে তাপসী বললো, এই যাঃ ! মস্ত ভুল হয়ে গেছে।

সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করল, কি হল ? কিছু ফেলে এসেছেন !

—না। ফেলে আসিনি। আচ্ছা, এত রাত্রে কোন মিষ্টির দোকান খোলা আছে।

—তা পাওয়া যেতে পারে। কিনবেন ? অ্যাঁ, আমাদেরও ভুল হয়ে গেছে। আমাদের খাবারের সঙ্গে প্যাকেট দু-তিনটে আপনার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

—না, সেসব নয়। আমি একবাক্স মিষ্টি কিনব আমার মায়ের জন্য। আপনাদের খাবারের প্যাকেটে চপ কাটলেট ছিল—আমার মা বিধবা, ওসব খান না।

—আপনার ভাই-টাই নেই ?

—আছে।

তাপসী একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাড়ি পৌঁছতে এগারোটার বেশি হয়ে যাবে। মা অপেক্ষা করে বসে থাকবেন। আজ তাপসী মায়ের জন্য একখানা সরু পাড়ের ভাল তাঁতের শাড়ি কিনেছে। তার প্রথম উপার্জনের টাকা থেকে সে নিজের জন্য এ পর্যন্ত একটা পয়সাও খরচ করেনি। ট্রেন ভাড়ায় কয়েক টাকা বেরিয়ে গেছে অবশ্য। মাকে প্রণাম করে সে আজ কাপড় ও সন্দেশের বাক্সটা দেবে। মা অবাক হয়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় পেলি ? তাপসী কিছু উত্তর দেবে না।

মা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, তাপসী কখনও কোন অন্যায় করতে পারে না। দিদিকে খানিকটা সাহায্য করার জন্যই সে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করছে। তা ছাড়া পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখেই বা কি হবে আর ? কেউ তো আজকাল চাকরি পায় না।

বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে নামল তাপসী। নেমেই দেখল, তার পাশ দিয়ে একটা সাইকেল রিকশা চলে যাচ্ছে, সেটাতে বসে আছে মানসী। দিদিও আজ এত রাত করে ফিরছে ?

মানসীকে দেখেই তাপসী একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। অপরাধী অপরাধী মুখ তার। মাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখা যায়, কিন্তু দিদিকে ভুল বোঝান সহজ নয়।

মানসী কিন্তু তাপসীকে দেখে একটুও অবাক হল না। মানসীর মেজাজ আজ ফুরফুরে। হাসি মুখেই জিজ্ঞেস করল, কিরে তুই-ও এই ট্রেনে ফিরলি নাকি ? কলকাতায় গিয়েছিলি ?

তাপসী বললো হ্যাঁ।

মানসী ভাবল, স্টেশনে অমলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সে যখন গল্প করছিল, তখন কি তাপসী দেখেছে ? দেখুক। আজ রাত্তিরেই তো সব জানবে।

মানসী বলল, উঃ, আজ ট্রেনের যা অবস্থা ! আমি তো ভেবেছিলাম, আসতেই পারব না। তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

—এক বন্ধুর বাড়ি ?

—ট্রেনে কি ভিড়, কি ভিড় ! বসার জায়গা পেয়েছিলি ?

—হ্যাঁ। কেউ দরজা খুলেছে না কেন ?

বাড়ির মধ্যে অন্য কার যেন গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দরজা খুলে দিলেন ওদের প্রতিবেশী এক বৃদ্ধা। তাঁকে ওরা পিসীমা বলে।

পিসীমা বললেন, উঃ, এতক্ষণে ফিরেছ ? এদিকে বাড়িতে কি কাণ্ড !

ওরা দুজনে প্রায় একই সঙ্গে বললো, কি হয়েছে পিসীমা ?

—এস, বাড়ির ভেতরে এস। তোমাদের এত দেরী হল কেন ? আমি ভাবনায় চিন্তায় মরছি।

ওরা প্রায় দৌড়ে চলে আসে ভেতরে। খাটের ওপরে মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। ভিজে কাপড় দিয়ে কপাল মুছে হিমানী।

মানসী জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে রে হিমানী ?

হিমানী খুব মৃদু গলায় বলল, দুপুরে ছোড়দা বাড়িতে এসেছিল। তখন পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

—পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে কেন ?

পিসীমা বললেন, সে কি কাণ্ড ! দু'গাড়ি ভর্তি পুলিশ। অতগুলো মিলে এসেছিল ঐটুকু একটা ছেলেকে ধরতে। ঘরদোর সব তছনছ করে দিয়েছে। থানায় নিয়ে গিয়ে কি মার মেরেছে ছেলেটাকে। লোকগুলো কি মানুষ ! ওদের বাড়িতে ছেলেমেয়ে নেই ?

তাপসীর হাত থেকে বড় ব্যাগটা ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। সেটার দিকে মনযোগ না দিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে গেল মায়ের খাটের কাছে। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, হিমানী, মা কখন থেকে এরকম হয়ে আছে রে ?

—সন্ধ্যে সাতটা থেকে !

তাপসীর এক পলকের জন্য মনে পড়ল, সেই সময় সে মঞ্চে ওঠে নায়কের মন ভোলাবার জন্য গান গাইছিল।

মানসীর মনে পড়ল, সেই সময় সে ময়দানে অমলের পাশে বসে ছিল। অমল খেলা করছিল তার হাত নিয়ে।

পিসীমা বললেন, তোমাদের মা গিয়েছিল থানায়। চার ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল বাইরে। তাও ছেলেটাকে একবারও দেখতে পেল না। শুনলাম নাকি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মানসী শুধু অস্ফুট ভাবে জিজ্ঞেস করল, বেঁচে আছে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে সব কিছু ভয় নেই। পাড়ার অপূর্ববাবুও গিয়েছিলেন থানায়—তিনি শুনে এসেছেন যে কাল কোর্টে জামিন দেবে। তবে, টাকা লাগবে। হাজার দু-এক টাকা তো বটেই। তারপর কেস চালানোর খরচ। বেশ কিছু টাকার ধাক্কায় পড়ে গেলে তোমরা। একেই এই দিনকাল—

মানসী আর একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না। জানলার পাশে গিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর পিসীমা অনেক কিছু বললেন। হিমানী পুরো ঘটনাটা শোনালো। তাপসী প্রশ্ন করল বারবার। মানসী একবারও মুখ ফেরাল না।

একটু বাদে পিসীমা চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যে ডাক্তার এসে দেখে গেছেন মাকে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। চিন্তার কিছু নেই।

চিন্তার কিছু নেই, তাই মানসী আর কিছু চিন্তা করছে না। সে শুধু অন্ধকারের দিকে ফাঁকা চোখে চেয়ে আছে।

তাপসী কাছে এসে ডাকল, এই দিদি!

মানসী সাড়া দিল না।

তাপসী আবার তার পিঠে হাত দিয়ে ডাকল, এই দিদি!

মানসী যেন বহুদূর থেকে ফিরে এল। বললো, উঁ?

—এখন কি হবে?

মানসী সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে বলল, কি আবার হবে? শুনলি ত বেঁচে আছে।

—মাকে কি করে সামলান যাবে?

—মা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে শুনলাম, কাল সকালের আগে ত আর জাগছে না—

—কাল কে থানায় যাবে?

—কে আবার যাবে? আমিই যাব। সে কালকের কথা কালকে! রান্না ঘরে গিয়ে দ্যাখ খাবার টাবার কি আছে! কিছু যদি থাকে ত গরম কর। খেয়ে নিই। আর বেশি রাত করে কি হবে?

এই রকম অবস্থায় খাবারের কথা এতই অপ্রাসঙ্গিক যে তাপসী

রীতিমতন অবাক হয়ে গেল। হিমানীও মুখ তুলে তাকিয়েছে দিদির মুখের দিকে।

মানসী রীতিমতন ঝাঁঝালো গলায় বললো, দেরী করছিস কেন? যা। আমাদেরও তো বেঁচে থাকতে হবে?

এতক্ষণ বাদে মানসী মায়ের কাছে গেল। আলতো করে তার কপালে হাত রাখল। মানসীর চোখ শুকনো। তার বুকের মধ্যেও ত কোন কান্না নেই। মাকে তার আজ অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু এখন সে একটা সান্ত্বনার বাক্যও শোনাতে পারবে না।

এগার

মানসী তিনদিন অফিসে আসে নি, অফিসের সবাই সেজন্য সচকিত। মানসী কক্ষনো অফিস কামাই করে না। তিন বছর ধরে সে চাকরী করছে, কখনো তার অসুখও করে নি। অথচ তিনদিন ধরে অফিসে আসছে না, কোনো চিঠিও পাঠায়নি, টেলিফোনেও কোনো খবর দেয়নি। অফিসের অনেকেই এ নিয়ে আলোচনা করছে।

অভিমান হয়েছিল অমলের। মানসী তাকেও কোনো খবর পাঠালো না! একটা টেলিফোন তো করতে পারতো অনায়াসে। তৃতীয় দিনে অভিমানের বদলে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। কোনো দুর্ঘটনা হয়নি তো? আগের দিন অমল মানসীকে হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে, সেদিনই মানসীর বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সব বলার কথা ছিল। তার পরদিন মানসীর অফিসে না আসার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

অমলের মনে হলো, তার উচিত মানসীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া। মানসীর বাড়ি সে চেনে না। চুঁচড়োয় থাকে—এইটুকু শুধু জানে। অফিস থেকেই ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু অ্যাকাউন্টস ডিপার্ট-মেণ্ট থেকে ঠিকানা জানতে গেলে তারা কি ভাববে?

চতুর্থ দিন মানসী এলো অফিসে। চেহারায় অসুখ বিসুখের কোনো চিহ্ন নেই। এতদিন অনুপস্থিত থাকার কোনো কারণ দেখালো

না কারুকে, ছুটির দরখাস্ত করে কাজে যোগ দিল। এমনিতেই সে কারুর সঙ্গে বেশি কথা বলে না—আজ সম্পূর্ণ চুপচাপ।

কিছুক্ষণ ছটফট করার পর অমল আর থাকতে পারলো না। মানসীর টেবিলের সামনে এসে কাজের কথার ছুতোর এক ফাঁকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, এই তিনদিন আসো নি কেন?

ভাবলেশহীন মুখ তুলে মানসী বললো, এমনি।

—এমনি মানে?

—বাঃ, ছুটি নিতে নেই? আমার ছুটি পাওনা আছে।

অমল আর দাঁড়াতে পারলো না। অফিসের অনেক লোক ইদানীং তাদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। কেউ কেউ হাসাহাসি করে। অমল পরিষ্কার করে কারুকে কিছু বলতে পারে নি।

খানিকটা বাদে অমল আর একটা ফাইল এনে রেখে গেল মানসীর টেবিলে। ফাইলের নিচে একটা আলাদা কাগজ, তাতে লেখা, "সাড়ে পাঁচটার সময় মৌলালির মোড়ে এসো।"

সাড়ে পাঁচটার একটু আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে অমল। সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবার পরও মানসী আসছে না দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল, মানসী বোধহয় আসবেই না। কিন্তু তাকে আসতে দেখা গেল একটু বাদেই। আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে। অমলও হাঁটতে লাগলো—অফিসের এত কাছাকাছি জায়গায়—একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না।

পাশিপাশি আসার পর অমল জিজ্ঞেস করলো, তুমি আজ টিফিনের সময় ক্যান্টিনে গেলে না কেন?

মানসী বললো, এমনি। ইচ্ছে করলো না।

—তার মানে, সারাদিন কিছু খাওনি?

—খিদে পায়নি।

—তোমার কি হয়েছে বলো তো? শরীর-টরীর খারাপ হয়েছিল?

—না, কিচ্ছু হয়নি।

—তবু সারাদিন না খেয়ে আছো? চলো, এক্ষুণি কিছু খেয়ে নেবে চলো।

—বললুম তো খিদে নেই।

—খিদে না থাকলেও খেতে হবে। চলো—

ওরা গিয়ে বসলো একটা রেস্টুরেন্টের কেবিনে। মাংস ও মোগলাই পরোটার অর্ডার দিল অমল। তারপর মানসীর একটা হাত টেনে নিয়ে বললো, কি ব্যাপারটা হয়েছে, আমাকে বলো তো !

ক্লিষ্টভাবে হাসার চেষ্টা করে মানসী বললো, কিচ্ছু হয়নি তো !

অমলের মুখে রীতিমতন দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠলো। আহত কণ্ঠস্বরে বললো, তুমি আমাকে কিছু বলবে না ? সব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছো ? সেদিন হাওড়া স্টেশনে সব কথা হয়ে গেল। তারপর কি হয়ে গেল এর মধ্যে ? তিনদিন অফিসে এলে না কেন ? কেন আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছো না ?

মানসী চোখ তুলে তাকালো অমলের দিকে। বিষণ্ণ ভাবে বললো, তুমি সত্যি খুব ভালো। আমি তেমোর যোগ্য নই।

—বাজে কথা বলো না। কি কি হলো, সব খুলে বলো আমাকে। সেদিন রাত্তিরে গিয়ে তোমার মাকে বলেছিলে ?

—না।

—বলো নি ? কেন. তোমার লজ্জা পাচ্ছে ?

মানসী আবার হাসলো। বড় অদ্ভুত এই হাসিটা। বললো, লজ্জা ? আবার হাসলো। বললো, না, লজ্জা পাওয়ার বয়েস আমার নেই। মাকে কিছু বলতে পারি নি—কারণ শোনার মতন অবস্থা নেই আমার মায়ের। গত তিনদিন ধরে আমার মা ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। থাক্ গে, ওকথা আর মাকে বলার দরকারও হবে না।

অমল স্তম্ভিত ভাবে বললো, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন ? কেন, কি অসুখ হয়েছে ?

—অসুখ না। আমার ভাইয়ের জন্য। *এই তিনদিন ধরে আমার* ভাই বাঁচবে কিনা ঠিক ছিল না।

—কি হয়েছে তোমার ভাইয়ের ?

—বেঁচে গেছে শেষ পর্যন্ত। পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। মারধর করার পর পুলিশ যে কি করেছিল তাকে নিয়ে সেটাই জানতে পারছিলাম না। কেউ বলছিল, তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে, কেউ বললো, পুলিশ তাকে একেবারে মেরে কোনো মাঠে-ঘাটে ফেলে দিয়েছে। আমরা ওকে খুঁজেই পাচ্ছিলাম না।

—কেন ধরা পড়লো কেন ?

—পুলিশের গাড়িতে নাকি বোমা মেরেছিল। তা মারতেও পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তার খোঁজ পেয়েছি, হাসপাতালেই আছে। পুলিশ একটু দয়া করেছে। আগামী সোমবার ওকে কোর্টে হাজির করবে—বোধহয় বেল দিয়ে ছাড়িয়ে আনা যাবে।

—এরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, অথচ আমাকে কোনো খবর দাও নি ?

—খবর দিলে তুমি কি করতে ?

—কিছু হয়তো সাহায্য করার চেষ্টা করতাম।

—অতদূরে চুঁচড়োয় গিয়ে তুমি কি সাহায্য করতে ? ওখানে তো কারুকে চেনো না তুমি। খবর দিলে তুমি শুধু শুধু ব্যস্ত হয়ে উঠতে।

একটু চুপ করে থেকে মানসী আবার বললো আমার ভাই রঞ্জু এবার বোধহয় শেষ পর্যন্ত বেঁচে উঠবে। কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, না বাঁচলেই ভালো হতো।

অমল চমকে উঠে বললো, না, না, ওকথা বলো না।

—আমাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে তো ? কিন্তু অনেক দুঃখে এই কথা বলছি ! ও মরবার আগে আমাদের সবাইকে মারবে। ছেলেবেলা থেকে ও আমাদের জ্বালাচ্ছে। ওকে কিছুতেই মানুষ করা গেল না। আমি সংসারটা একটু সামলে উঠেছিলাম, আবার সব নষ্ট হয়ে গেল। ওকে বেল দিয়ে ছাড়ানো, মামলার খরচ, চিকিৎসার খরচ এসব কোথা থেকে আসবে ? সম্বলের মধ্যে আছে শুধু আমাদের বাড়িটা—এবার সেটাও বিক্রি করতে হবে।

—বাড়ি বিক্রি করলে তোমরা থাকবে কোথায় ?

শূন্য চোখে তাকিয়ে মানসী বললো, জানি না। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে একটু হাসল। বললো, কোথাও ঘর ভাড়াটাড়া করে থাকবো আর কি !

অমল মানসীর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললো, এই জন্যই বলেছিলাম, ব্যাপারটা যদি একটু তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যেত—আমি তোমাদের বাড়িতে থাকতে পারতাম। আমি হয়তো অবস্থা সামলে নিতেও পারতাম।

হাত সরিয়ে নিয়ে মানসী বললো, তা হয় না। অমল, এই তিনদিন

আমি অনেক ভেবেছি। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও তোমার কথা বারবার মনে পড়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলা উচিত নয়। তুমি খুব ভালো, কিন্তু আমি কেন স্বার্থপর হবো? আমার দুর্ভাগ্য আমাকেই সহ্য করতে হবে।

—তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না?

—না। এই রকম অবস্থায় কি বিয়ে হয়?

—কেন হবে না? ভূমিকম্পের মধ্যেও মানুষের বিয়ে হয়।

—সে কথা আমি জানি না। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে আমার সঙ্গী হিসেবে পাবো। তুমি ভালোবাসা দিয়ে আমার জীবনের ভার কমিয়ে দেবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমি ভালোবাসা পাবারও যোগ্য নই। তুমিও আমাকে ভালোবাসতে পারবে না।

—মানসী, তুমি আমার ভালোবাসায় অবিশ্বাস করছো? আমি তোমাকে ভালোবাসি না?

—ভালো করে ভেবে দ্যাখো অমল, তুমি যেটাকে ভালোবাসা মনে করছো, সেটা আসলে দয়া। তুমি আমাকে দয়া করতে চাইছো। একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে, তুমি তাকে সাহায্য করতে চাইছো। দয়া ছাড়া এটাকে আর কি বলবো?

—তুমি ভুল করছো—

মানসী ম্লান ভাবে তাকালো। খুব নরম গলায় আপন মনে বলার মতন করে বললো, না আমি ভুল করিনি। আমি কারুর দয়া নিতে পারি না। কিছুতেই পারি না।

বারো

গুপ্তদা টেলিফোন তুলে বললেন, হ্যালো। গুপ্ত স্পীকিং। আপনি কে কথা বলছেন? তাপসী? তাপসী কে? আমি চিনতে পারছি না ঠিক।

টেলিফোনের ভেতর থেকে ভীতু ভীতু মেয়েলি গলা ভেসে এলো,

আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনাদের অফিস ক্লাবে থিয়েটার করেছিলাম—

গুপ্তদা ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বললেন, ও, তাপসী মানে, আমাদের বইতে সুদেষ্ণার রোল যে করেছিল? তা কি খবর? টাকা-ফাকা কিছু বাকি আছে? তাহলে সেক্রেটারিকে ফোন করুন।

—না, সেজন্য নয়। আপনি দীঘা যাবার কথা বলেছিলেন—

—দীঘা? কবে?

—আপনি যেদিন বলবেন।

—আমি যেদিন বলবো?

গুপ্তদা উৎফুল্লভাবে হেসে উঠলেন। তারপর হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলেন, আত্মহত্যা করা হলো না?

—কি বলছেন?

—বলছি যে, আত্মহত্যা করা হলো না? খুব আশা করেছিলাম খবরের কাগজে দেখতে পাবো—

—আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

—কবে?

—আজই? যদি আপনার সুবিধে হয়।

—আজই? এত গরজ! বেশ ঠিক আছে—আমার অফিস ছুটি হবে আর আধঘণ্টা বাদে—তারপর, তুমি মেট্রো সিনেমার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো—তুমি কি রঙের শাড়ী পরে এসেছো?

—সাদা। কেন, আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন না?

—বলা যায় না! মেয়েদের মুখ আমার মনে থাকে না।

পুরো আধঘণ্টা তাপসীকে ঐ সিনেমা হলের সামনে ঘোরাঘুরি করতে হলো। প্রতিটি মুহূর্তকে এক ঘণ্টা মনে হয়। অন্য লোকেরা সন্দেহ-জনক ভাবে তাকাচ্ছে তার দিকে। কেউ কেউ কাছাকাছি এসে ফিসফিস করে কি যেন বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাপসীকে এখন আর এ সব গ্রাহ্য করলে চলবে না।

গুপ্তদা এলেন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আধঘণ্টা পরে। গাড়ি থামিয়ে ডাকলেন তাপসীকে। গাড়িতে ওঠার পর প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, খিদে পেয়েছে?

তাপসী বললো, না তো!

—তাহলে মুখ শুকনো কেন?

—কই? দুপুরবেলা বেরিয়েছি, এত রোদ্দুর।

—হুঁ। হঠাৎ দীঘায় বেড়াবার ইচ্ছে হলো কেন?

তাপসী মুখ নিচু করে খুবই আস্তে আস্তে বললো, আমার খুব টাকার দরকার। আপনি বলেছিলেন—

—হঠাৎ টাকার দরকার হলো কেন?

—সে আছে একটা ব্যাপার।

—বুঝলাম! তোমার কী ধারণা টাকা রোজগার করা খুব সোজা? আমার সঙ্গে দীঘা কিংবা পুরীতে গেলেই আড়াই শো টাকা পাওয়া যাবে? অনেক মেয়েই তো যেতে চায়।

—কিন্তু আপনি বলেছিলেন—

—হ্যাঁ, বলেছিলাম। তোমাকে আমি একটা অফার দিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ রকম মুখ গোমড়া করে তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে—আর সব সময় ভাববে কখন টাকাটা পাবো—তা হলে কি চলে? তাহলে আর অন্য মেয়েদের সঙ্গে তোমার তফাৎ কোথায়? তোমাকেও ব্যাপারটা এন-জয় করতে হবে—

তাপসী জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললো, আমি তো মুখ গোমড়া করে থাকিনি।

গুপ্তদাও হাসলেন। ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে বললেন, বেশ, বেশ। আমার মনে হচ্ছে, খিদের জন্যই তোমার মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে। সুতরাং তোমাকে এখন কিছু ভালো খাবার খাওয়ানো দরকার। খাবার পরও যদি মুখখানা এই রকম থাকে, তা হলে ক্যানসেল! তাহলে তোমার সঙ্গে আমার চলবে না! খাবার খাওয়াবার জন্য তোমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাবো জানো? আমি দোকান টোকানে খাবার খাই না। তুমি আমার বাড়িতে যাবে। আপত্তি আছে?

তাপসী ঘাড় নেড়ে বললো, না।

—আমার ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি, জানো তো?

—জানি।

—ঠিক আছে, চলো—

গুপ্তদার ফ্ল্যাটটা নিরিবিলি পাড়ায়। প্রতিবেশীরা উঁকিঝুঁকি মারে না। সাধারণত ব্যাচেলারের ফ্ল্যাট বললেই এলোমেলো অগোছালো ঘর মনে হয়, কিন্তু গুপ্তদার ফ্ল্যাট রীতিমতন সাজানো গোছানো। সব কিছুই ছিমছাম পরিষ্কার। একজন ছোকরা চাকর সেখানে কাজ করছিল, গুপ্তদা অম্লানবদনে তাকে ছুটি দিয়ে দিলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে বললেন, ব্যস, আর কেউ আসবে না। নিশ্চিন্ত! দেখি, খাবার দাবার কি আছে।

গুপ্তদা প্লেটে করে মুরগীর মাংস ও পাউরুটি এনে রাখলেন টেবিলে। হুকুম করলেন, আগে খেয়ে নাও।

খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই তাপসীর। কিন্তু গুপ্তদার কথা অগ্রাহ্য করার সাহস পেল না। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, খাওয়ার পর মনটা একটু চাঙ্গাই লাগলো।

গুপ্তদা বললেন, যাও, ঐখানে বাথরুম আছে, মুখ টুখ ধুয়ে এসো। গা ধোবে কিংবা চান করবে? তাও করতে পারো—দুটো তোয়ালে রাখা আছে।

বাথরুম থেকে ফিরে আসবার পর তাপসী দেখলো গুপ্তদা জামা খুলে ফেলেছেন। পাজামা ও গেঞ্জি পরা। ব্যায়াম করা সুন্দর স্বাস্থ্য। আরাম করে পা ছড়িয়ে সোফার ওপর হেলান দিয়ে বসেছেন। সিগারেট টানছেন জানলার দিকে তাকিয়ে। তাপসীকে দেখে বললেন, এবার বলো।

তাপসী এতক্ষণে খানিকটা আড়ষ্টতা কাটিয়ে যেতে পেরেছে। সরল-ভাবে হেসে বললো, আমি কি বলবো? আপনিই তো বলবেন!

—আমি বলবো? আচ্ছা বেশ। তুমি আমার সঙ্গে দীঘা কিংবা পুরী যেতে চাইছো। যেদিন তোমাকে আমি এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেদিন তুমি বলেছিলে এর বদলে তোমার পক্ষে আত্মহত্যা করাই ভালো। হঠাৎ মত বদলালে কেন?

তাপসী কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে গুপ্তদা নিজেই আবার বললেন, উত্তরটা অবশ্য বোঝাই যায়। হঠাৎ কোন কারণে তোমার খুব টাকার দরকার হয়েছে। টাকা তুমি পাবে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে আমি কি চাই তা তুমি বুঝতে পারছো তো?

তাপসী চুপ করে গুপ্তদার মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে।

—তুমি কবে যেতে চাও?

—কাল।

—কাল? এত তাড়াতাড়ি?

—হ্যাঁ। আমাকে রবিবারের মধ্যে ফিরে আসতেই হবে।

—এখন বৃষ্টি নেমে গেছে, এখন পুরী কিংবা দীঘায় বেড়াতে গেলে ভালো লাগবে না। তা ছাড়া আমার অফিসে জরুরি কাজ পড়ে গেছে, এখন ছুটিও পাবো না আমি। কিন্তু তোমার কি টাকাটা খুব তাড়াতাড়ি দরকার?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কি করা যায়? এক কাজ করতে পারো, তুমি আমার এখানেই ক'দিন থেকে যাও—তিন চার দিন জানলা দরজা বন্ধ করে দিলে তখন পুরী-দীঘা কলকাতা সবই তো এক। কি রাজী?

তাপসী তখনো কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে গুপ্তদা আবার রীতিমতন এক ধমক দিয়ে বললেন, কি, রাজী কিনা বলো না! আমি বেশী সময় নষ্ট করা ভালোবাসি না।

তাপসী আঙুল দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে কম্পিত গলায় বললো, সারাদিন থেকে, রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে যেতে পারি? অন্তত একদিন পর—

গুপ্তদা আবার পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে হাসলেন। চোখ দুটো কৌতুকে সমুজ্জ্বল। বললেন, তার মানেই রাজী! বাকি অ্যারেঞ্জমেণ্ট পরে ঠিক করা যাবে। উঠে এসো, আমার পাশে বসো।

দ্বিধা করলো না তাপসী। স্থির পায়ে উঠে এসে সামান্য দূরত্ব রেখে বসলো গুপ্তদার পাশে। গুপ্তদা বাঁ হাতটা রাখলেন তাপসীর কাঁধে। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপারের মতন ডান হাত বাড়িয়ে তাপসীর বুকের কাছে শাড়ীর আঁচলটা আলতো করে ধরে বললেন, এটা আর রেখে লাভ কী? শাড়ীটা খুলে ফেল। নইলে কুঁচকে যাবে।

তাপসী দুটো হাত বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে শক্ত করে রেখে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলো গুপ্তদা'র দিকে। তার উনিশ বছরের নিষ্পাপ যৌবন, এ পর্যন্ত কোনো পুরুষের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। প্রথমেই একটা পাপের স্পর্শ।

গুপ্তদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অন্য লোক এই সময় কি করে

জানো ? তার ভালোবাসার কথা বলে। তারা বলে, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমাকে না পেলে আমি মরে যাবো! তোমার মতন মেয়ে পৃথিবীতে আর নেই—এইসব। মেয়েরা এইসব কথা শুনলে গলে যায়। কিন্তু আমি মেয়েদের ভালোবাসতে পারি না। ভালোবাসা-টাসা আমার বুকের মধ্যে নেই। তবে মেয়েদের শরীর আমার ভালো লাগে। মেয়েদের শরীর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে আমার মনটা বেশ ঝরঝরে থাকে। আমি অনেক পরিশ্রম করে, মাথার কাজ করে টাকা রোজগার করি। আর মেয়েরা শুধু তাদের শরীরটার জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়। তবে, এ নিয়ে আমি কোনো লুকোছাপা করি না। আমি মিথ্যে কথা বলতে ভালোবাসি না। তুমি ঐ রকম ভূতের মতন তাকিয়ে আছো কেন আমার দিকে? বুঝতে পারছো না আমি কি বলছি?

তাপসীর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। সে কিন্তু কাঁদতে চায় না—তবু কোথা থেকে এই চোখের জল আসছে কে জানে!

গুপ্তদা সেদিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। নির্লিপ্তভাবে বললেন, অনেকেই প্রথম প্রথম কাঁদে। ঠিক আছে, একটু কেঁদে নাও। মিনিট দশেক সময় দিচ্ছি।

গুপ্তদা উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা মদের বোতল ও গেলাস নিয়ে এলেন। গেলাসে খানিকটা ঢেলে তিনি বললেন, তুমি খাবে? এটা ব্রাণ্ডি। অনেকে ওষুধ হিসেবেও খায়। খেলে তোমার উপকারই হবে। খাবে না? তাহলে খেয়ো না।

গুপ্তদা এবার তাপসীর উল্টো দিকের চেয়ারে বসেছেন। ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসিটি লেগেই আছে। বললেন, পরীক্ষার রেজাল্ট জানতে গিয়ে ফেলের খবর পেলে কিংবা ইণ্টারভিউ দিয়েও চাকরি না পেলে মনটা খারাপ হয়ে যায় না? তোমারও এখন মন খারাপ হবে। তুমি ফেল করেছো। তোমাকে আমার দরকার নেই।

তাপসী চমকে তাকালো, চোখ মোছার চেষ্টা করলো।

গুপ্তদা আবার বললেন, তুমি ফেল করেছো, বুঝলে? তুমি এখন যেতে পারো।

তাপসী সোজা হয়ে বসলো। তারপর কম্পিত হাতে ফেলে দিল আঁচল।

—ওসব করে আর লাভ নেই। একটা অনিচ্ছুক, ভয় পাওয়া মেয়েকে আমি জোর করে ভোগ করি না। আমি তো পার্ভার্ট নই। আমি স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ! যাক গে, এবার বলো তো, টাকাটা তোমার এত দরকার কেন? আত্মহত্যা না করেও টাকার জন্য এসেছো কেন?

তাপসী উত্তর দিচ্ছে না দেখে গুপ্তদা আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করে থেকো না! টাকাটার এত দরকার কি জন্য?

—আমার ভাই হাসপাতালে ··অনেক খরচ ··মায়ের অবস্থা খারাপ ·· আমার দিদি একা পারছে না···

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুপ্তদা বললেন, আমার কাছে আগে যে-সব মেয়েরা এসেছে, তারাও বলেছে, মায়ের অসুখ, বাবার চাকরি নেই—ভাইয়ের পরীক্ষার ফি এইসব। কেউ বলেনি তার নিজের শাড়ী কেনার ইচ্ছা হয়েছে কিংবা ভালো খাবার খেতে ইচ্ছে হয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েদের বিউটিই এটা, তারা নিজেদের আনন্দের জন্য কিছু করে না—সবাই অন্যের জন্য।

তাপসী অসহায় হাহাকারের মতন বললো, আমি সত্যি কথা বলছি, বিশ্বাস করুন—

—বিশ্বাস আমি অনেক আগেই করেছি। কারণ, তুমি অভিনয় করতে জানো না। তুমি একটি চমৎকার মেয়ে এবং বোকা মেয়ে। তোমার কপালে আরও অনেক দুঃখ আছে।

গুপ্তদা আবার উঠে গিয়ে আলমারি খুললেন। ফিরে এলেন এক তাড়া দশ টাকার নোট নিয়ে। তাপসীর কোলের ওপর সেটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, এতে শ'চারেক টাকা আছে। আমার কাছে আর বেশী নেই এখন। দ্যাখো, যদি এটা কোনো কাজে লাগে। শোনো, শিগগিরই টাকাটা ব্যাগে ভরে নাও! কোনোরকম প্যানপ্যানানি আমি শুনতে চাই না। তুমি যদি টাকাটা না নিতে চাও তাহলে আমি এত রেগে যাবো যে চড় চাপড়ও মারতে পারি।

তাপসীকে আর কোনো কথা বলারই সুযোগ দিলেন না গুপ্তদা। কাছে এসে তাপসীর এক হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, এখন বাড়ি যাও। তোমার সঙ্গে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই আমার। এখন একটু ক্লাবে যাবো, ফুর্তি-টুর্তি করবো। ওঠো, ওঠো—

তাপসী বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলো। গুপ্তদা আফশোষের সুরে বললেন, আজকের সন্ধ্যেটাই মাটি করলে! ভেবেছিলাম বেশ একটু ফুর্তি-টুর্তি হবে। যাও, বাড়ি যাও! আর কখনো এসো না!

তাপসী তবু বলতে গেল, আপনি আমাকে শুধু শুধু টাকা দিলেন—

তাকে শেষ করতে না দিয়েই গুপ্তদা দাবড়ানি দিয়ে বললেন, ফের ঐ সব কথা! বলেছি না, আমি এসব শুনতে ভালোবাসি না! আমি এসব শুনতে ভালোবাসি না! আমি দয়ালু নই। দান-টান করি না। এমনি ইচ্ছে হ'লো দিলাম! এ নিয়ে আর কোনো কথা শুনতে চাই না। মুখ টুখ ভালো করে মুছে নাও—আমার এখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরুলে লোকে দেখে ভাববে কি? দাঁড়াও, তুমি হাওড়া যাবে তো—আমি তোমাকে কিছুটা রাস্তা পেঁছে দিতে পারি!

রাস্তায় বেরিয়ে গাড়িতে বসে তাপসীর সঙ্গে থিয়েটার বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন গুপ্তদা। তাপসীকে আর অন্য প্রসঙ্গ তুলতেই দিলেন না।

লাল আলোর সামনে গাড়ি থেমে আছে। সাদা দাগ দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে মানুষ। তাদের মধ্যে মানসী আর অমলকে দেখতে পেল তাপসী। নিজেকে সামলাতে পারলো না, অস্ফুটভাবে বললো, আমার দিদি!

গুপ্তদা উৎসুকভাবে বললেন, কই? কোন্ জন? ঐ যে হলদে শাড়ী? বাঃ, বেশ দেখতে। তুমি যে বলেছিলে তোমার দিদি কোনো ছেলেটেলের সঙ্গে কথা বলে না? এ তো দিব্যি একজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি চিনি ঐ ছেলেটাকে, ওর নাম অমল। বেশ প্রেমিক প্রেমিক টাইপ—

মানসীও এক পলকের জন্য দেখতে পেল তাপসীকে। রাস্তা পার হয়ে বিবর্ণ মুখে বললো, আমার বোন—

অমল বললো, কোথায়? ঐ গাড়িতে? ও কার সঙ্গে বসে আছে? চেনো ওকে?

মানসী মাথা নেড়ে জানালো, না।

অমল বললে, আমি চিনি ভদ্রলোককে, মিঃ গুপ্ত—ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। তোমার বোনকে ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করো—লোকটি সুবিধের নয়—অনেক বদনাম শুনেছি।

মানসী কোনো না কথা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো শুধু।

লাল আলো নিভে গেছে। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে আবার। তাপসী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই মানসীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়ি। গুপ্তদা তাকিয়ে দেখলেন, তাপসী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাঁর চোখে কৌতুকচ্ছটা নেচে উঠলো। হঠাৎ গাড়িতে ব্রেক কষে বললেন, এই যে মেয়েটা, শোনো! এটা কি হচ্ছে কি? এরকম যাচ্ছেতাই রকমের কান্না, এটা কি নাটক হচ্ছে নাকি গাড়ির মধ্যে?

তাপসী কান্না সামলাতে পারছে না। কেন যে সে কাঁদছে, তা সে নিজেই জানে না। তার এইটুকু জীবনে এতখানি জটিলতা আগে কখনো আসে নি। বাড়ি বিক্রি করে দিতে হবে শুনে সে টাকা রোজগার করার জন্য ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছিল। ব্যাপারটা অন্যরকম হওয়ায় এখন তার শরীরটা অসম্ভব দুর্বল লাগছে। এখন অজ্ঞান হয়ে যেতে পারলেই সবচেয়ে আরামের হতো।

—কি, কান্না থামাবে কি না? এসব আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

—আপনি আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিন! আমি আর পারছি না!

—বাঃ, চমৎকার কথা। গাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে নামবেন একজন যুবতী—অমনি রাস্তার সব বীর পুরুষদের রক্ত গরম হয়ে উঠবে, আমাকে ঘিরে ধরে প্যাঁদানিও দিতে পারে! আজ সন্ধ্যেটা তো খুব মজার দেখছি!

গুপ্তদা তাকালেন পেছনের দিকে। একটু দূরে ফুটপাথে মানসী আর অমল তখনও দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ে আছে এই গাড়ির দিকে। গুপ্তদা গাড়িটা ব্যাক করে নিয়ে এলেন ওদের কাছে। পেছনের দরজা খুলে দিয়ে অমলের উদ্দেশ্যে বললেন, এই যে অমলবাবু উঠে পড়ুন। কাম অন, জয়েন আস্।

অমল ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলো। গুপ্তদা তখন নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। মানসীর কাছে গিয়ে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বললেন, মানসী দেবী, আপনার বোনকে অপহরণ করার তালে ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আপনার চোখে পড়ে গেলাম। এদিকে আপনার বোনটি তো একের

নম্বরের ছিঁচকাঁদুনে। যাই হোক, এসব আলোচনা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে, না আমার গাড়িতে উঠবেন?

মানসী আস্তে আস্তে বললো, আপনাকে তো আমি চিনি না।

গুপ্তদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, চেনার কোনো দরকার নেই। মানুষকে চেনা তো সহজ নয়। আপনার ভাই কি এখনো হাসপাতলে আছে? চুঁচুড়াতেই?

একটু ইতস্তত করে মানসী বললো, হ্যাঁ।

অমলের দিকে ফিরে গুপ্তদা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গিয়েছিলেন দেখতে?

—না।

—আপনি তো বেশ লোক মশাই! হাসপাতালে না গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। চিন্তা ভাবনায় কোনো লাভ হবে না, আসল দরকার হচ্ছে কাজ! তার জন্যে দেরী করা ঠিক নয়। নিন উঠুন গাড়িতে উঠুন।

গুপ্তদা একরকম প্রায় জোর করেই ওদের দু'জনকে গাড়িতে তুললেন। পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে বললেন, এটা পরিষ্কার আছে, চোখ আর একদম কান্না দেখতে চাই না।

অমলের দিকে ফিরে বললেন, থানা-পুলিশ, হাসপাতাল এসব জায়গায় দৌড়োদৌড়ি করা কি মেয়েদের কাজ? পুরুষরাই হিমসিম খেয়ে যায়। চলুন গিয়ে দেখা যাক, কতদূর কি করা যায়।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আপন মনেই বললেন, আমিও এসব কাজে কখনো করিনি। আমি আমার এরিয়ার বাইরে চলে যাচ্ছি! হয়তো এতেও নতুন রকমের আনন্দ পাওয়া যাবে।

রাস্তা বেঁকতেই গাড়িতে ঢুকলো এক ঝলক হাওয়া, ওদের চুল এলোমেলো করে দিল। সেই গাড়ির ভেতরের চারজন মানুষ সেই মুহূর্তে পরস্পরকে খুব আপন মনে করলো।

———